বিজ্ঞানকর্মী সংসদ প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

দশম বর্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা
অক্টো-ডিসে 1987 □ দু' টাকা

কমপিউটার

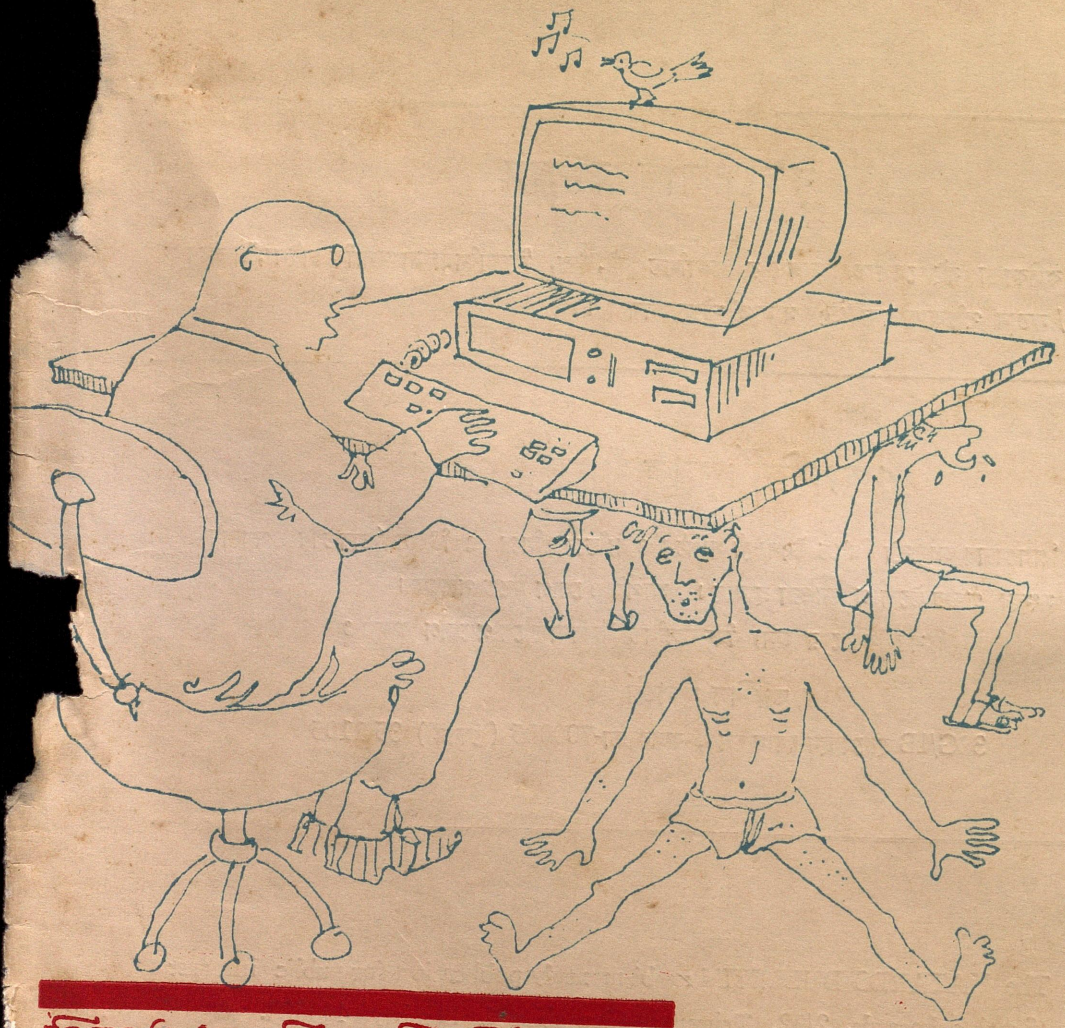

সমর সেন
স্মরণ ও শ্রদ্ধা
প্রসঙ্গ
আদিবাসী চিকিৎসা
কমপিউটার
কিছু কথা কিছু প্রশ্ন
পারমাণবিক শক্তি
প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?
বি-ও-বি'র দশ বছর
জীবনী আলোচনা
প্রাকৃতিক বিপর্যয়
'মন'
পরিবেশ দূষণ
প্রসঙ্গ
হাইড্রোজ ই.পি.

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1987

একাদশ বর্ষ
দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 বি-ও-বি'র কথা

2 সমর সেন ঃ প্রয়াণ, স্মরণ ও শ্রদ্ধা

3 'আদিবাসী চিকিৎসা ঃ একটি বিকল্প ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে
☐ আশিস কুণ্ডু

6 কমপিউটার ঃ কিছু কথা কিছু প্রশ্ন
☐ সুরঞ্জন কর

11 পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প ঃ প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?
☐ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

13-18 ☐ বি-ও-বি'র দশ বছর ☐ (ক্রোড়পত্র)

13 জীবনী আলোচনায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
☐ রবীন মজুমদার

14 মনুষ্যকৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয়
☐ কুমারেশ মিত্র

16 বি-ও-বি'তে 'মন'
☐ অমল সোম

17 পরিবেশ দূষণ আলোচনায় বি-ও-বি
☐ পার্থ সেন

19 আরো বিকলাঙ্গ শিশু অথবা আর হাইড্রোজ ই. পি নয়
☐ সুদীপ্ত সরস্বতী

22 মন্দিরবাজার ঃ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি
☐ দীপক

24 জপুরে ক্রোমিয়াম দূষণ সরষের মধ্যে ভূত
☐ সুরশ্রী চৌধুরী

প্রচ্ছদ
সমীর রায়

যোগাযোগের ঠিকানা

ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', c/o অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 106 সল্ট লেক, কলকাতা-700064 ☐ সাক্ষাতে যোগাযোগ ঃ 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-700009 (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে)। সোমবার সন্ধ্যা 7 টার পর। এছাড়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 7–8টা কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তিনতলায় 'ইয়ুথ হোস্টেল'-এর ঘর। **সকলকে অনুরোধ করছি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীটের ঠিকানায় চিঠি দেবেন না।**

বইমেলায় আসুন

কলকাতা বই মেলায়, আমাদের প্রকাশিত বই, "না, হিরোশিমা নাগাসাকি চাইনা," আর পুরনো / নতুন পত্রিকার জন্য 'উৎস মানুষ' স্টলে আসুন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান যাঁদের নেশা

'অ্যামেচার অ্যাস্ট্রোনমি'তে উৎসাহী সংগঠন ও ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সমন্বয় সংস্থা গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপনিও যোগ দিতে পারেন।

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আশিস মুখার্জী

32G/1B হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-700085 (ফোন) 35-1105

The HAZARDS BULLETIN : a bi-monthly publication for public interest groups fighting hazards. 2/32, Trimurti, Chunabhatti, Bombay 400022.

Individual : Rs. 15·00 Institutional : Rs. 30.00.

বি-ও-বি'র কথা

চলমান ঘটনাপ্রবাহ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

ধর্ম ও বিজ্ঞান-সম্পর্কের আসল চেহারা এখনও প্রায় সবারই অজানা। তা পাশ কাটিয়ে তাই এখানে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য—যা বেশ জরুরী বিষয়। ধর্ম নয়, জনগণ-এর আসল 'আফিং', বোধ হয়, সংস্কার—যা জড়িয়ে থাকে আমাদের বিশ্বাস ও অস্তিত্বের শেকড়-বাকড়। সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে হোক, সব ধর্মের মানুষরাই কম-বেশি নানা অর্থহীন সংস্কার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন—অশিক্ষা ও অজ্ঞতা শুধু তার পরিমাণ বাড়ায়। যে সংস্কারগুলো প্রগতির পথে সত্যি প্রবল বাধা এবং প্রকৃতিতে অমানবিক, আমাদের জেহাদ এখানে, মূলত, তাদের বিরুদ্ধেই।

নেহাৎ তত্বকথা হিসেবে অনেকেরই জানা যে ধর্ম আর লোকাচার সমার্থক নয়। উৎসের কথা ভাবলে লোকাচার অর্থও সাধারণভাবে, অনাচার বা ব্যভিচার নয়—অত্যাচার তো অবশ্যই নয়। কিন্তু ব্যবস্থা ও ব্যবহার-দোষে তাদের অনেকগুলোই সময়ের সাথে সাথে অতিবিকৃত ও অসামাজিক চরিত্র অর্জন করে; ফলে তখন তা হ'য়ে পড়ে অবশ্য-বর্জনীয়।

ঠিক সেটাই ঘটেছিল অতীতে 'সতীদাহ' ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সমাজ-সংস্কারকদের দীর্ঘ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আপোষহীন সংগ্রামের ফলে এই পৈশাচিক এবং অমানবিক কুপ্রথাটি অবলুপ্ত হয়েছিল। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা আলাদা। কিন্তু সেই আদিম পাশবিক ব্যবস্থাটিকে হালে ফের নতুন মাত্রায় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে প্রায় গোটা উত্তর ভারত-জুড়ে—রাজস্থানের রূপ কানোয়ার-এর 'সতী' হওয়ার পরবর্তী সমস্ত ঘটনাস্রোত আসলে হিন্দু মৌলবাদীদের মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠার এক অশুভ ও ভয়াল ইঙ্গিত। হয়তো এর উৎপত্তির ইতিহাস ও কারণ আছে। কিন্তু এক ধর্মের মৌলবাদকে তো অন্য আরেক ধর্মের মৌলবাদ দিয়ে কোনঠাসা করা যায়না—করতে হয় যুক্তি, বিজ্ঞান ও কঠিন সচেতনতার শক্তি দিয়ে। সাম্প্রদায়িক শক্তি—তা সে যে ধর্মেরই হোক—সব সময়ই বিভ্রান্ত ও বিচারবুদ্ধিহীন। কিছু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল এবং মতান্ধ ও আচারসর্বস্ব ধর্মীয় মৌলবাদীদের যোগসাজসে তৈরি সব রকমের সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক শক্তির সমূল উৎপাটন ও বিনাশ আজ খুব জরুরী প্রয়োজন।

কিন্তু বাস্তবে তা কতদূর সম্ভব? কেন বলছি একথা? কেন এই সন্দেহ? কারণ, সর্ষের মধ্যেই যে ভূত (!) লুকোনো। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানকর্মী তথা প্রগতিশীল সমাজকর্মীরা পর্যন্ত নিজেরাই এখনও নানা ক্ষতিকর ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কার-এর শিকার। তাঁদের মধ্যেই রয়ে গেছে সভ্যভব্য (!) ধরনের পণপ্রথা, নিঃশব্দ বধূ-হত্যা বা নীরব বধূ-নির্যাতন-এর মানসিকতা। নানা অজুহাতে তাঁরাও গড্ডলিকায় গা ভাসাতেই ব্যস্ত। বিজ্ঞান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদেরও এখন পর্যন্ত নিছক পেশা—একেবারেই 'ওয়ে অফ লাইফ' নয়। আরও তাজ্জব ব্যাপার যে এ নিয়ে কারুরই প্রায় তেমন কোনো মাথা-ব্যথা নেই! 'চলছে-চলবে'র ঘোরেই সবাই এ ব্যাপারে দিব্যি উদাসীন ও নির্বিকার। প্রগতিশীল সমাজকর্মীদেরও নিজেদের প্রচার এবং আচার-আচরণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত অসঙ্গতি—উৎকট অসামঞ্জস্য। তাইতো এতসব দ্বিধান্বিত প্রশ্ন আমাদের।

তবু গত এক দশকে আশাব্যঞ্জক বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ শুরু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানকর্মীরা নানা সংগঠনের নিচে সমবেত ও সক্রিয় হচ্ছেন ধর্মীয় কুসংস্কার ও বহু সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশেই অঞ্চল ভিত্তিতে অনেক বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান-সংস্থা তৈরী হয়েছে—বিভিন্ন ভাষায় কার্যকর বেশ কিছু কিছু পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকা বের হচ্ছে এবং এঁদের সবারই ঘোষিত লক্ষ্য ও আদর্শ প্রায় এক—বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি। 'ভারতীয় জনবিজ্ঞান জাঠা' সম্প্রতি একই উদ্দেশ্যে কিছু কর্মসূচী নিয়েছেন—যা নীতিগত-ভাবে অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু অনুসৃত কর্মপন্থা ও রূপায়ণ পদ্ধতি? আমরা নিঃসংশয় নই! সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যের সীমাবদ্ধতা থাকেই। কেননা, যুগ-যুগ ধরে বয়ে-আসা অকেজো সংস্কার ও কুসংস্কার-এর ধারা এক মাস বা কয়েক বছরের তপ্ত প্রচারেই নিশ্চয় শুকিয়ে যায় না, তৈরি হয়ে যায় না পরিপূর্ণ ও খাঁটি বিজ্ঞান মানসিকতা। তা সময়-সাপেক্ষ—তার জন্য চাই অতি দীর্ঘ মেয়াদী প্রচার-আন্দোলন, লাগাতার প্রচেষ্টা ও কর্মসূচী।

আর চাই দৃষ্টান্তস্থাপন। সেটাও আজ খুব দরকারি। যাঁরা বিজ্ঞান-মহিমা প্রচার করবেন, লড়বেন কুসংস্কার-এর বিরুদ্ধে, তাঁদের নিজেদের 'উপদেষ্টা' থেকে উল্লেখযোগ্য 'উদাহরণ' হয়ে উঠতে হবে। নইলে মানুষ তো বলতেই পারেন—"ডক্টর, হিল দাইসেল্ফ!" তত্ত্ব ও প্রয়োগ, চিন্তা ও কর্মে সমন্বয় ঘটাতে না পারলে সমস্ত প্রচারই হবে আগের মতই নিষ্ফল, অন্তঃসারশূন্য এবং অসার। তাই সাময়িক উন্মাদনায় নয়, ভেবে চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরস্থিরভাবে যা বলছি আর যা করছি-র ভেতর যাথাসম্ভব সুসংগতিস্থাপনের কাজটিকে অগ্রাধিকার দেওয়াই আজ প্রতিটি সচেতন বিজ্ঞানকর্মীর প্রায় আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

—সুব্রত ভট্টাচার্য □

সমর সেন ঃ প্রয়াণ, স্মরণ ও শ্রদ্ধা

"Even in the best of times, the truth does not hang like a ripe fruit, waiting for anyone to pick it. Truth must be fought for and always will have to be fought for, regardless of the ntaure of the particular society in which it may exist; it is only the form of the struggle that will change"—

কথাগুলো বলেছিলেন হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর 'লিটারেচার অ্যান্ড রিয়্যেলিটি'' নামক গ্রন্থে। প্রয়াত সমর সেন-এর সম্পূর্ণ একক ব্যক্তি-জীবন, মনে হয়, এ কথাগুলোরই আক্ষরিক অনুবাদ ও প্রতিধ্বনি। যতটুকু চোখে দেখেছি তাঁকে, বা গল্প শুনেছি এবং পড়েছি তাঁর সম্পর্কে, তাতে মনে হয়, যে তিনি সেই মানুষ—যিনি তাঁর পরিপূর্ণ জীবনে কখনও স্বধর্মচ্যুত হননি— 'সমর' শব্দটিকে আদ্যোপান্ত পবিত্র পতাকার মত সম্মান প্রদর্শন ক'রে গিয়েছেন। হতে পারে, তাঁর সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল লেখনীর গন্ডীর মধ্যেই এবং স্বকীয় এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সজাগও ছিলেন—যার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বাবুবৃত্তান্ত' নামক গ্রন্থে তাঁর লেখা আত্মকথন থেকে—"আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হ'ত—এবং এখনো হয়—যে বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে। চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় আনতে না পারলে বড়জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায়, কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না।" [বাবুবৃত্তান্ত, সমর সেন, পৃঃ 55]

কবি হিসাবে তাঁর প্রথম দীপ্ত, দৃপ্ত আবির্ভাব এবং কবি হিসেবেই বাংলা সংস্কৃতি-মঞ্চে আলোড়ন সৃষ্টি। এবং তা তাঁর কবিতার 'আলো' এবং 'রণ' এ দুয়ের জন্যই। কবিতায় তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গোক্তি (মূলত বাবুসমাজের প্রতি এবং কখনও তা তাই নিজের প্রতিও) ও ঋজু গদ্যধর্মিতা মনে করিয়ে দেয় ম্যাথু আর্নল্ড-এর সেই বিখ্যাত কাব্যতাত্ত্বিক উক্তি ঃ "Poetry is at bottom a criticism of life"। কিন্তু, যখন কবিখ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে তিনি, তখনই হঠাৎ-একদিন "রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয়না কবিতায় / যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে / বছর দশেক পরে যাবো কাশীধামে" এই ঘোষণা-বলে প্রায় আনুষ্ঠানিক-ভাবে কবিতার আসর থেকে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন। এবার শুরু হ'ল তার অন্বেষণ—সঠিক আত্মপরিচয় সন্ধান। জীবিকার দিক থেকে প্রথমে অধ্যাপনা ও কিছুদিন AIR-এ চাকুরি, তারপর The Statesman পত্রিকায় সাংবাদিকতা, পরে মস্কোয় অনুবাদকের কাজে আত্মনিয়োগ শেষেও অতৃপ্ত সমর সেন ফিরে আসেন দেশে। সম্ভবত 'চাকুরি' শব্দটির সংগে 'সমর' শব্দের যে অন্তর্গত সংঘাত বারেবারে তিনি তার বলি হয়েছেন। মস্কো থেকে ফিরে প্রথম কিছুদিন বেকার তারপর The Hindusthan Times পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ গ্রহণ থেকে NOW পত্রিকার সম্পাদনা পর্যন্ত সমর সেন-এর জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটায় সমর সেন কাজে ইস্তফা দেন। NOW পত্রিকায়ই সমর সেন প্রথম সরাসরি সম্মুখ সমরে নেমে পড়েন তখনকার ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। ভীষণ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠে 'NOW' পত্রিকা— বিশেষত বুদ্ধিজীবী মহলে। সমর সেনের অসাধারণ ইংরেজী সাহিত্যশৈলী, বৈদগ্ধ্য, উচ্চকন্ঠ ঝাঁঝালো প্রতিবাদ, অন্যায়-অত্যাচার ও অ-গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা নানা তির্যক বলিষ্ঠ মন্তব্য, ভারতীয় পরিস্থিতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ NOW-এর মালিক গোষ্ঠী খুব বেশিদিন গলাধঃকরণ করতে পারলেন না—না পারারই কথা, কারণ, টি. এস. এলিয়টের মতে "Humankind cannot bear very much reality"! NOW পত্রিকা গোষ্ঠী সমর সেন-এর ইংরেজির কলমের জোর ও তীক্ষ্ণধী মূলধন ক'রে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের কথাই ভেবেছিলেন—বামপন্থী মতবাদের প্রবল জোয়ার তৈরি তাদের স্বভাবতই খুবই অনভিপ্রেত ছিল। কিন্তু নিজের জীবিকার জন্য সমর সেন 'সন্ধি' বা 'সমঝোতা' জানতেন না। নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ অনমনীয়তায় এবং মর্যাদাবোধের প্রশ্নে 'NOW' পত্রিকা থেকেও সমর সেনকে বিদায় নিতে হ'ল।

এবারে শুরু হ'ল 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা। এই হ'ল তাঁর শেষ রণতরী। জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত শ্রী সেন এ পত্রিকার পরিচর্যায়ই ব্যস্ত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ কাঁপানো অতিক্রান্ত যে সত্তরের দশক তার মেজাজ ও পায়ের ধ্বনিটিই ছিল 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার বুকের স্পন্দন। তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তিময় পৌরুষ, নিরলস সংগ্রাম, অকুতোভয় রাজনৈতিক বোধ, অকুন্ঠ বিপ্লবপ্রীতি 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা ও অক্ষরে মুদ্রিত আজও। শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ কীভাবে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হ'তে পারে এই-ই যেন ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। বিজ্ঞান নীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনার স্থান ছিল তাঁর পত্রিকায়; বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার ব্যাপারে বিজ্ঞান-প্রেমিক মানুষের মধ্যে চেতনাসৃষ্টির প্রয়াসেও নিযুক্ত থেকেছে 'ফ্রন্টিয়ার'। নিউক্লিয়ার শক্তি-বিরোধী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন যুগিয়েছেন বরাবর। মহাশক্তিধর দুটি সুপারপাওয়ারের মধ্যে আপাত-সংঘর্ষের আড়ালে গোপন আঁতাত-টিকেও তিনি বারেবারে পাঠককে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। দেশে 1975-77-এর জরুরী অবস্থার সময়েও তিনি 'ফ্রন্টিয়ার'কে প্রেস-সেন্সরশিপ-এর ভেতর দিয়ে সুযোগ্য কান্ডারীর মত চালিয়ে নিয়ে যান কোনমতে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার পক্ষেও তিনি ছিলেন এক সদা-জাগ্রত প্রহরী। আইনসিদ্ধ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এবং সংবাদপত্রজগতে গোটা সত্তরের দশক জুড়ে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে তিনিই ছিলেন প্রায় একমাত্র নির্ভীক কন্ঠস্বর।

তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এক বড় মাপের সৎ ও সংগ্রামী মানুষকে হারিয়েছে—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ——সঃ মঃ, বি-ও-বি □

বি-ওবি'র মার্চ-এপ্রিল 1987 সংখ্যায় শ্রীসুনীল মাহাতো একটি বিকল্প চিকিৎসা-ব্যবস্থা হিসাবে আদিবাসী চিকিৎসার সম্ভাবনার কথা লিখেছিলেন। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়েছে নিচের নিবন্ধে।

'আদিবাসী চিকিৎসা ঃ একটি বিকল্প ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে

—আশিস কুণ্ডু

পেশায় চিকিৎসক হওয়ায় আর ঘটনাগতভাবে গত ছ'বছর মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত থাকায়, একটা দায়িত্ব অনুভব করছি শ্রী সুনীল মাহাতোর লেখা (বি-ও-বি মার্চ-এপ্রিল, 1937) "আদিবাসী চিকিৎসা—একটি বিকল্প ব্যবস্থা" প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করার।

আদিবাসীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন। যে অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের কাছাকাছি থাকার সুযোগ আমার হয়েছে, সে অঞ্চলের নাম ছত্তীসগঢ়। ছত্তীসগঢ়ের একটা এলাকায় থেকে আমি কাজ করেছি। সেই অর্থে আমার অভিজ্ঞতা সীমিত এবং এই অভিজ্ঞতাকে নিশ্চয় ব্যাপক ভাবে সাধারণীকরণ (generalise) করা যায় না। তবে এই সীমিত অভিজ্ঞতারও একটা গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি।

'আদিবাসী চিকিৎসা ব্যবস্থা' বলতে যদি কোনো ব্যবস্থার কথা বোঝানো হয়, তাহলে সেটা ভুল হবে। বিশেষ কোনো 'চিকিৎসা ব্যবস্থা' আদিবাসীদের মধ্যে টিকে নেই, বিশেষ কিছু পদ্ধতি অবশ্যই টিকে আছে—যে পদ্ধতিগুলো তাদের জীবনযাত্রা, সংস্কার সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

> "'আদিবাসী চিকিৎসাব্যবস্থা' বলতে যদি কোনো ব্যবস্থার কথা বোঝানো হয়, তাহলে সেটা ভুল হবে।"

আজকে আদিবাসীরা মূলত তিন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন। শিল্প নগরীগুলির আশে পাশে, সমতল কৃষিনির্ভর এলাকায় আর পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায়। "নির্ভেজাল" আদিবাসী রীতি-নীতি-পদ্ধতি আজ কোথাও অবশিষ্ট নেই—আধুনিক জীবনের আক্রমণ কমবেশী সব জায়গাতেই ঘটেছে। এরই মধ্যে জঙ্গল এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে "নির্ভেজাল" রীতি-নীতি-পদ্ধতিগুলো টিকে আছে।

বর্তমানে আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলধারা যাদের মাধ্যমে চলে আসছে—তাদের ছত্তীসগঢ় অঞ্চলে বলা হয় "বৈগা"। সমতল এলাকায় বৈগা ছাড়াও দেখা যায় বৈদ মহারাজদের। আর প্রায় সব এলাকাতেই 'এ্যালোপ্যাথিক' চিকিৎসা পদ্ধতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এছাড়া আছেন সুইন—ধাত্রী বা দাই যারা প্রসবকালীন মায়ের দায়িত্ব নেন। আদিবাসী সমাজে বৈগারা একটি সম্মানিত সম্প্রদায়। কোনো কোনো এলাকায় এরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দায়িত্বে, কোথাও চিকিৎসার দায়িত্বে, আবার কোথাও দুটি দায়িত্ব একই বৈগা পালন করে থাকেন।

আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষ যে রূপ তা হলো কিছু রীতি-রেওয়াজ এবং ঝাড়ফুঁক,। এর সাথে মিশে আছে জড়িবুটি গাছ, গাছালির ব্যবহার; আর আছে কিছু ব্যবহারিক পদ্ধতি, পথ্য ও আচরণবিধি (যেমন জ্বর হলে রুগী কি খাবে, অথবা ছোটো শিশুর পেটের রোগে মা কি কি করবে এবং করবে না, ইত্যাদি)। এখানে ঝাড়ফুঁক আর জড়িবুটির চিকিৎসাকে আলাদা করা কঠিন। এটা বলা সম্ভব নয়, জড়িবুটির পদ্ধতি একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি আর ঝাড়ফুঁকের পদ্ধতি একটি আলাদা পদ্ধতি। দুটোই ঘনিষ্ঠভাবে মিলে মিশে আছে।

আমার কাজের সূত্রে বেশ কিছু বৈগার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। কয়েকজন বৈগার সাথে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে মেশারও সুযোগ পেয়েছি। (এঁদের মধ্যে দুজন পরবর্তীকালে একটি শ্রমিক সংগঠনের সাথে যুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী হয়েছেন) এছাড়া এমন অসংখ্য আদিবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে, যাঁরা বিভিন্ন রোগজ্বালায় বৈগাদের কাছে চিকিৎসা করিয়েছেন বা করান।

> "আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে সূতিকা রোগের কোনো সুচিকিৎসা আদিবাসীদের মধ্যে নেই।"

বৈগাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণভাবে আদিবাসীদের জীবনের সংস্কার, ধর্মীয় ভাবনা, রীতি-নীতি-আচরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই চিকিৎসায় রহস্যময়তা (element of mystification) জড়িয়ে আছে—এর সাথে যুক্ত হয়েছে অতিপ্রাকৃত (supernatural) কিছু ক্ষমতা প্রয়োগের মানসিকতা যেটা এক বৈগা থেকে অন্য বৈগার আলাদা। মূলত নাড়ী দেখে ওষুধ দেওয়া হয়। আগেই বলেছি—ওষুধের মধ্যে আছে গাছ-গাছালি, জড়িবুটি আর ফুঁকা (বিশেষ রীতিতে ফুঁ দেওয়া, এটা বৈগার বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ)। কখনও কখনও ওঝাদের ধরনের কিছু শারীরিক কষ্ট দেওয়া, আর আছে পথ্য ও আচরণবিধির বিশেষ ভূমিকা।

প্রাচীন যাদুবিদ্যার প্রভাব ও তার প্রয়োগ আদিবাসী চিকিৎসা-প্রণালীতে মিশে রয়েছে। রোগচিকিৎসায় অনুরূপ বা আপাত সাদৃশ্যযুক্ত

কোন বস্তুর প্রয়োগ খুব সরলীকৃতভাবে কাজে লাগানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ সন্তান জন্মের পর মায়ের দুধ কম হলে বা না হলে সেই সব ফলমূল খেতে বলা হয় যা কাটলে বা চিরলে দুধের মতো কিছু বেরোয় (যেমন পেঁপে)। অথবা নবজাত বাচ্চার গাঁটে পুঁজ হলে গাটিয়া গাছের রস (এমন গাছালি যার অনেক গাঁট আছে) খাওয়ানো হয়।

এই পদ্ধতিগুলিতে চিকিৎসার ফলাফল হিসেব করলে দেখা যাবে মানসিক রোগের (হিস্টীরিয়া ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অথবা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এই পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত ভালো কাজ করে। যেমন একটা নির্বিষ সাপে কাটা রুগী যখন বিষাক্ত সাপ কামড়েছে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন (এই আতঙ্ক থেকে মৃত্যুও হতে পারে), তখন একজন স্বনামধন্য বৈগার ঝাড়ফুঁকে তিনি মানসিক জোর ফিরে পান এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু শরীরজাত অধিকাংশ রোগেই এই চিকিৎসার ফলাফল অত্যন্ত খারাপ—হয় কোনো লাভ হয় না, না হলে ক্ষতি হয়। এই পদ্ধতির গুণাগুণ আলোচনায় আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, এই পদ্ধতিগুলি আদিবাসী জীবনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অত্যন্ত কাছের পদ্ধতি। আদিবাসীরা এই পদ্ধতিকে চেনেন, জানেন, খুব সহজেই এর ভেতরে বাইরে ঘোরাফেরা করেন (কিন্তু 'এ্যালোপ্যাথিক' চিকিৎসা পদ্ধতি আদিবাসী জীবনের থেকে অনেক দূরের, ধরা-বোঝার বাইরের একটা জিনিস)। এর থেকে সম্ভবত অনেক কিছু শেখার আছে। এরপর এই পদ্ধতিতে যা থাকে অনেক ওষুধ (মূলত গাছ-গাছালি, শেকড়) আদিবাসীদের মধ্যে আছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন কোনো ওষুধ আদিবাসীদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে নেই যা বিষাক্ত সাপে কাটা রুগীকে বাঁচাতে বা সুস্থ করতে পারে। আর সূতিকা রোগ আদিবাসী অঞ্চলে আমি এত দেখেছি, শুধু হাসপাতালে নয়, তাদের পরিবেশে গিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে বৈগারাই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন সুচিকিৎসার জন্য, যে আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে সূতিকা রোগের কোনো সুচিকিৎসা আদিবাসীদের মধ্যে নেই।

হাড় ভাঙ্গার যে চিকিৎসার কথা শ্রী মাহাতো লিখেছেন সেই চিকিৎসা শুধু আদিবাসীদের মধ্যে নয় অন্য এলাকাতেও—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, নামের এবং পদ্ধতির সামান্য তারতম্যে। এই পদ্ধতিতে ভাঙ্গা হাড়কে সেট্‌ (set) করে কিছু লতাপাতা বেটে লাগানো হয় এবং তারপর সরল পদ্ধতিতে অনড় (immobilisation) করা হয়। এ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতির অর্ধেক বা তারও কম সময়ে এই পট্টি (splinting) খুলে ফেলা হয় এবং মালিশ ইত্যাদি করা হয়।

ছত্তীসগঢ় অঞ্চলের এই পদ্ধতির একজন স্বনামধন্য চিকিৎসকের সাথে আমি যোগাযোগ করি এবং তাঁর কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি সসম্মানেই আমাকে আপ্যায়ন করেন কিন্তু তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিকে ভগবানপ্রদত্ত বলে জানান এবং বেশ কিছুটা গোপন ভাব বজায় রাখেন। এর পরে আমি হাসপাতাল থেকে বেশ কিছু হাড়ভাঙ্গা রুগীকে তাঁর কাছে পাঠাই (মূলত রুগীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে)। অত্যন্ত

"যে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে "দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির ব্যয়বহুলতা আর্থিক শোষণের নামান্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে"—তা আদিবাসী চিকিৎসাপদ্ধতিকে ছেড়ে দেবে এবং শোষণের হাতিয়ার করবে না এটা ভাবাটা ঠিক নয়।"

"সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ বাদ দিয়ে কোনো বিকল্প চিকিৎসার কথা ভাবাটা আর স্বপ্নরাজ্যে বাস করা একই ব্যপার। একদিকে যেমন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির "ভারতীয়তার" প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে তেমন বৈষম্য দূর না হলে বৈষম্যমূলক বিকল্প তৈরি হবে—এক এক শ্রেণীর মানুষের জন্য এক এক ধরনের বিকল্প। আদিবাসীদের জন্য পড়ে থাকবে ওই 'আদিবাসী চিকিৎসাব্যবস্থা'।"

তার কতটা ভালো এবং উপযুক্ত তা অবশ্যই খোলা মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই করে দেখতে হবে। তা না করে আদিবাসী চিকিৎসায় হরেক রকম দাওয়াই আছে—'এটা সারে ওটা সারে', এটা বলার কোনো অর্থই হয় না। এতে আদিবাসীদেরও সম্মান দেখানো হয় না, (কাপড়ের অভাবে যে লোকটি লেংটি পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার লেংটি পড়ার মহান ঐতিহ্য নিয়ে আমরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে লোকটি নিশ্চয় সম্মানিত বোধ করবে না)—বিকল্প চিকিৎসারও কোনো সুরাহা হয় না।

শ্রী মাহাতোর লেখা অসঙ্গতিপূর্ণ, একপেশে এবং—তাঁর কিছু কিছু ধারণার পেছনে কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। সাপে কাটার ওষুধ 'হনুমান-গদ' আর সূতিকা রোগের ওষুধ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবী। সাপে কাটার দুঃখের সাথে লক্ষ্য করি এদের একটা বড় অংশের হাড় ঠিকমতো জোড়া লাগে নি এবং অন্যান্য জটিল সমস্যার জন্ম হয়েছে। জটিল ধরনের হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে ইনি কোনো ভূমিকাই নিতে পারেন নি। আমি মূলত যা জানতে বা শিখতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তা হল ঐ বিশেষ পাতার গুণাগুণ যা বেটে ভাঙ্গা হাড়ে লাগানো হয়। এখনও পর্যন্ত তা ঠিকমতো জানতে পারি নি। তবে প্রথমে শুনে যতখানি চমৎকৃত হয়েছিলাম এখন ভাঙ্গা হাড় জোড়ায় ঐ পাতার ভূমিকা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

তবে ঐ পদ্ধতিতে যা দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি তা হল কিছু বিশেষ ধরনের পক্ষাঘাত (যেমন পোলিও) ইত্যাদিতে তাঁর নিজস্ব প্রক্রিয়ায়

ম্যাসাজ (massage) এবং physiotherapy। এগুলি রুগী এবং তার আত্মীয়স্বজনের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং ফলপ্রসূ।

শ্রী মাহাতো কোথাও বলেছেন, "আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির যেরকম কিছু ভালো দিক আছে তেমনই আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতিরও কিছুটা সবারই গ্রহণযোগ্য হতে পারে"। আবার অন্য জায়গায় বলেছেন, "অনুসন্ধান করে অনুমিত হয়েছে যে আদিবাসী চিকিৎসাপদ্ধতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাব্যবস্থা বিদ্যমান, মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদির সমস্ত প্রকার রোগ উপশমের ঔষধ আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতিতে আছে"। শেষোক্ত ধরনের দাবী অধিকাংশ আদিবাসী চিকিৎসকও করেন না এবং অধিকাংশ বৈগা আজকাল সময়বিশেষে 'এ্যালোপ্যাথিক' চিকিৎসা করাতে বলেন।

শ্রী সুনীল মাহাতোর লেখা প্রসঙ্গে এত আলোচনার প্রয়োজন এই জন্যই যে আজ সারা দেশে কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি মিলে "বিকল্প চিকিৎসা" নাম করে এক বিশেষ ধারার জন্ম দিচ্ছেন। আজকের সমাজের দোষত্রুটিগুলি দেখিয়ে পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়াই আমাদের জনতার মুক্তির পথ বলে মনে করছেন এবং করাচ্ছেন। আমাদের দেশে যা কিছু প্রাচীন তাকেই বিকল্প এবং বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। আমাদের দেশের অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আচার কুসংস্কারও এই ধারায় ঐতিহ্য এবং বিকল্পের পর্যায়ে পড়ে!

'এ্যালোপ্যাথিক' চিকিৎসা ব্যবস্থার যে দোষগুলি শ্রী মাহাতো দেখিয়েছেন সেগুলির অধিকাংশই সঠিক। কিন্তু কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা অনুধাবন করা দরকার। যে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে "দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যয়বহুলতা আর্থিক শোষণের নামান্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে"—তা আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতিকে ছেড়ে দেবে এবং শোষণের হাতিয়ার করবে না এটা ভাবাটা ঠিক নয়। এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মতোই ভেষজ ওষুধ বহু দেশী ও বহুজাতিক সংস্থার হাতের কেরামতিতে পণ্য হিসাবে বাজারে কাটছে ভালোই।

আর্থিক সামাজিক অসাম্যকে আমরা পরিবর্তন করতে পারব না—বা পারার চেষ্টা করব না আমাদের অক্ষমতার জন্য, ক্ষমতাবানদের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করে তাদের জন্য থাকবে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা আর দরিদ্র জনসাধারণের জন্য খুঁজে বার করব তাদের ঐতিহ্যবাহী নিখরচার চিকিৎসা—এটা অত্যন্ত বেঠিক ধারণা। এতে সরকারের সুবিধা অবশ্যই হবে। সমগ্র দরিদ্র জনগণ যদি নিজেদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজস্ব পদ্ধতিতে চালিয়ে নেন—আধুনিক চিকিৎসার দাবী না করেন তাহলে অর্থকোষের ওপর চাপ পড়বে কম—কিন্তু জনতার খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না।

এই ধারণা অত্যন্ত ভুল যে আদিবাসী জনতা আধুনিক চিকিৎসাকে পছন্দ করেন না। তাঁরা মূর্খ নন। এবং আজ প্রায় অধিকাংশ আদিবাসী এলাকাতেই কোনো না কোনো পথে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখকরভাবে নয়। শহর থেকে বহু দূরে অত্যন্ত নিবিড় জঙ্গল এলাকাতেও আদিবাসী গ্রামে আমি দেখেছি বৈগার কাছে INH ট্যাবলেট (টি-বি'র ওষুধ), গ্রামের লোকের যে কোনো কাশির চিকিৎসা ঐ দিয়েই হয়। টেরামাইসিন ক্যাপসুল আজ যে কোনো বৈগা যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করেন ঝাড়-ফুঁক ও জড়িবুটির সাথেই। দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে আদিবাসীরা আজ অনেক সময়েই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শহরে রুগীকে নিয়ে আসেন—কোনো "কোয়াক" অথবা এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে একটা ইঞ্জেকশনের ভরসায়।

সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ বাদ দিয়ে কোনো বিকল্প চিকিৎসার কথা ভাবাটা আর স্বপ্নরাজ্যে বাস করা একই ব্যাপার। একদিকে যেমন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির "ভারতীয়তার প্রয়োজন আছে" অন্যদিকে তেমন বৈষম্য দূর না হলে বৈষম্যমূলক বিকল্প তৈরি হবে—এক এক শ্রেণীর মানুষের জন্য এক এক ধরনের বিকল্প। আদিবাসীদের জন্য পড়ে থাকবে ওই 'আদিবাসী চিকিৎসা ব্যবস্থা'।

সহযোগিতা চাই

নর্মদা নদীতে একটি বিরাট বাঁধ প্রকল্পে গুজরাট ও মধ্য প্রদেশের এক লক্ষেরও বেশী মানুষ তাঁদের বসতি থেকে উৎখাত হবেন। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে প্রচারের উদ্দেশ্যে অতীতে এই ধরনের প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সম্পর্কে, তাঁদের আন্দোলন সম্পর্কে, একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করছেন শ্রী অবিনাশ দেশপাণ্ডে (B-20, Soami Nagar, New Delhi 110017)। খরচ পড়বে অন্তত কুড়ি হাজার টাকা। শ্রী দেশপাণ্ডে বি-ও বি-র মাধ্যমে আপনাদের কাছে আবেদন করেছেন—এই প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য করুন। তিনি জানিয়েছেন, যারা এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে শুধুমাত্র তাদের সহায়তা নিয়েই তথ্যচিত্রটি করবেন তিনি।

কমপিউটার আজকের সমাজ-সংস্কৃতির উর্দ্ধে সৃষ্ট অথবা আজকের ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বাইরের কোনো নিরপেক্ষ প্রযুক্তি নয়। কমপিউটারের সমালোচনা তাই শুধু একটি টেকনোলজির অপপ্রয়োগের বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

কমপিউটার

কিছু কথা কিছু প্রশ্ন

সুরঞ্জন কর

শহরভিত্তিক মধ্যবিত্ত জীবনে প্রযুক্তি যে সদাব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলছে তার মধ্যে "কম্পিউটার" এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। ষাটের দশকের শেষের দিকেই মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-কর্মচারী এই অতিমানবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পশ্চিমী দুনিয়ার উপহারের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বামপন্থার প্রভাবে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের ব্যবহারিক রূপ আর "কম্পিউটার"। প্রথম শ্লোগান উঠেছিল "কম্পিউটার দূর হঠো।" তারপর প্রায় দুই দশকের মধ্য দিয়ে কম্পিউটারের অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে নিয়মিত। কিন্তু কেবলমাত্র গত কয়েক বছর ধরেই কম্পিউটার সংক্রান্ত নীতি প্রবলভাবে প্রচারিত হচ্ছে আমাদের সার্বিক অসুস্থতার অন্যতম দাওয়াই হিসাবে। শিক্ষা থেকে প্রতিরক্ষা সমস্ত উদ্যোগেই এই টনিকটি নানান মাপে প্রভূত অনুপান সহযোগে ব্যবহারও হচ্ছে ধুম-ধাড়াক্কার সাথে। সাথে সাথে কম্পিউটার বিরোধিতার চেহারাও বদলেছে। এক তো প্রচার মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে সীমিত কিন্তু ক্ষমতাশালী মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শহরভিত্তিক শিকড়বিহীন মানুষদের সাংস্কৃতিক শূণ্যতাকে পূরণ করার জন্য এক সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরী হয়ে উঠছে যা পণ্যভিত্তিক, গিমিকসর্বস্ব, এবং অমানবিক। অন্য দিকে কম্পিউটারের বিরোধিতা করার ব্যাপারে ব্যবহারিক রাজনীতি (realpolitik), আর মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা অসুবিধার নানান মাত্রা সৃষ্টি করছে। পরিচ্ছন্ন সতেজ শ্লোগান ক্রমশই পরিণত হচ্ছে ফাঁপা কোলাহলে।

কম্পিউটার প্রচারক সংস্কৃতির মুখ্য দিক হল প্রযুক্তিকে সুখসর্বস্বতার দেবতার আসনে বসান এবং ভাগ্যহীন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের বস্তুত কুর্ণিসত পৃথিবীর অংশ হিসাবে দেখান, তথা প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করা। ধরুন টিভিতে একটা ছবি দেখান হল। এক বিরাট অফিসঘর, মলিন, নোংরা ধাঁচের, ফাটা কলারযুক্ত জামা পরা করণিকদের সামনের টেবিলে বিশাল বিশাল কাগজপত্রের স্তূপ, ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়িয়ে দেখান হল বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু কাজ হয় না বা হলেও হয় অত্যন্ত শ্লথগতিতে এবং ভুলের সম্ভাবনা থাকে অত্যন্ত বেশী। এইবার যাদুদণ্ডের ওঠানামায় দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়ে যায়, চলে আসে ছিমছাম টেবিল চেয়ারে সাজান উজ্জ্বল ঘরের ছবি, অল্প কিছু সুদর্শন মানুষ ততোধিক সুদর্শন কম্পিউটারের সাহায্যে রাতারাতি অজিয়ুসের গোয়াল সাফ করে ফেলেন, দর্শকেরাও মনের মধ্যে গেঁথে নেন প্রযুক্তি দেবতার এই রূপকে। অন্য দিকেও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক স্ট্যান্ডার্ড মতাদর্শের মাপকাঠিতে প্রযুক্তির ভালমন্দ মাপার দিকটি। কোন এক বিশেষ জায়গায় কম্পিউটার হয়ে ওঠে কালো কারণ তা রয়েছে নির্দিষ্ট ক্ষমতাকাঠামোর আওতায়, আর সেটাই হয়ে উঠতে পারে আলো, যদি তা ব্যবহৃত হয় অন্য কোন ক্ষমতার নির্দেশে। সময়ের সাথে সাথে এই ব্যবধান ক্রমশঃই হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর—আর ফ্যাসাদে পড়েন সেই মানুষেরা যাঁরা আশঙ্কিত রুটি রুজির কারণে। এমন কি যাঁরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কম্পিউটারের সমালোচনা করেন তাঁরা পর্যন্ত সময় সময় বিস্মৃত হন যে প্রযুক্তি দেখার পদ্ধতি হওয়া চাই ঐতিহাসিক, তার ক্রমপরিবর্তিত রূপের মাপকাঠিতে। নয়ত তার স্থির, তাৎক্ষণিক রূপের সমালোচনা আমাদের কোথাও নিয়ে যাবে না।

* * *

ব্যাবেজের গণকযন্ত্র থেকে আজকের মাইক্রোকম্পিউটার এক লম্বা পথ। অনেকেই জানেন যে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রযুক্তিভিত্তিক বৈশিষ্ট্যসহ, সময়ভিত্তিক এক একটি স্তরকে এক একটি প্রজন্ম হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই প্রজন্মের ফারাক দিয়েই চিহ্নিত করা হয় প্রযুক্তির প্রগতিকে, দেখান হয় কি ভাবে উন্নতি ঘটছে ব্যবহারিক তথা বৈষয়িক দিকগুলিতে। এর পিছনে থাকে গবেষণার নির্দিষ্ট চাপ, এই চাপ আবার নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক এলিট গোষ্ঠীগুলি দ্বারা, কারণ বিজ্ঞান গবেষণার পুঁজি যোগান তাঁরাই। এক্ষেত্রে, গবেষকরা ভাড়া খাটেন সামগ্রিক স্বার্থেই। গবেষণার চলমান অবস্থা বোঝানোর জন্য দেখানো যায় যে প্রথম যুগের ভাল্ভ নির্ভর কম্পিউটার ও আজকের বড় মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের মধ্যে কত তফাত রয়েছে, যদিও এক্ষেত্রে দুটিকেই "কম্পিউটার" নামে ডাকা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রযুক্তি চলমান—স্থির বা চিরায়ত নয়, সে তার গঠনকাঠামোর রূপ কেবলই পরিবর্তন করে; আর কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। '41 সালে ট্রানজিস্টারের আবিষ্কার থেকে '50-এর শেষদিকে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের আবিষ্কার এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে এই ঘটনাগুলিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসাবে দেখান হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, কম্পিউটার প্রযুক্তির এই যে পরিবর্তন যার, ফল কম্পিউটার এক নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে চলছে, তার পিছনে কোন শক্তি কাজ করেছে? লেনি সীগাল বলেছেন "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইউনাইটেড স্টেট্স, জার্মানী এবং ব্রিটেনে সমর তথা গোয়েন্দা বিভাগের অধীন গোষ্ঠীগুলি [এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের—লেখক] প্রথম

ডিজিটাল কম্পিউটারের উদ্ভব ঘটায়। যুদ্ধের পর পেন্টাগন, সেন্সাস ব্যুরো, অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলির চাপই ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে ক্রমশই জটিল কম্পিউটার তৈরীতে উৎসাহিত করে।"

এখানে দু একটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আধুনিক কম্পিউটারের গাণিতিক ভিত্তি বুলের বীজগণিত ও কম্পিউটার স্থাপত্যের মধ্যেকার সম্পর্ক এক সমাপতন হতে পারে, কিন্তু প্রযুক্তির টুকরো টুকরো অংশগুলির বিশেষ রূপগ্রহণের পিছনে কিছু নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই কাজ করেছে। অর্থাৎ কম্পিউটার নামের এই নির্দিষ্ট জিনিষটি কেন? অন্য কিছুও তো হতে পারত। আসলে এক্ষেত্রে চাহিদা দ্বারা প্রযুক্তির রূপ নিয়ন্ত্রিত হয় এমনটা মনে করা যেতে পারে। এই চাহিদা বাস্তবিক কি ধরনের? ঐতিহাসিক ভাবে দেখলে মনে হয় শিল্প-বিপ্লব পরবর্তীকালে আধুনিক বড় রাষ্ট্র তথা প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ এখানে প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। স্ট্যাফোর্ড বিয়ার বলেছেন—মানব মস্তিষ্ক হল এক দুর্বল তড়িৎ-রাসায়নিক কম্পিউটার, যার স্মৃতি ধারণ ক্ষমতা যে কোন আধুনিক কম্পিউটারের তুলনায় যথেষ্ট দুর্বল। আমরা জানি কম্পিউটারের মস্তিষ্ক তথা স্মৃতি ধারণ ক্ষমতা কম্পিউটারের ক্ষমতা বোঝানোর ক্ষেত্রে এক বৈশিষ্ট্যসূচক ভূমিকা পালন করে। আবার রাষ্ট্র সমেত সমস্ত বড় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে খুব বড় মাপের অতিমানবিক স্মৃতি সংরক্ষণ, গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের বিশ্লেষণ এবং তার প্রয়োজনমতো ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয়। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি খুব ভাল করে বোঝা সম্ভব। ধরুন একটি ছোট কম্যুনিটির ক্ষেত্রে তার সদস্য সংখ্যা কত থেকে শুরু করে কত খাদ্য সামগ্রিকভাবে কম্যুনিটির প্রয়োজন তা বের করা খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সব হিসাব তা সে মানুষ, গবাদি পশু বা শস্য, যারই হোক না কেন, এক অতিমানবিক পর্যায়ে চলে গেছে। সুতরাং প্রযুক্তির বিশেষ গবেষণায় এই দিকে দৃষ্টি থাকে এবং ক্রমশই তা প্রযুক্তির নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণে সাহায্য করে। আবার সামরিক দিক থেকে চিন্তা করলে সূক্ষ্ম তথা নিখুঁত কাজের প্রয়োজন অনুভূত হয় তা সে শত্রুপক্ষের রেডিও মেসেজ ধরে ফেলাই হোক বা মিসাইল ছোঁড়ার ক্ষেত্রেই হোক। লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল আঘাত হানার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে এখন অনেকেই জানেন। আবার ব্যবহারিক রাজনীতির দিক থেকে প্রযুক্তির নির্দিষ্ট রূপগ্রহণের দিকটি মোটা দাগে বোঝান যেতে পারে রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কম্পিউটার ফাইল তৈরী করা থেকে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর পাশাপাশি পশ্চিমী সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। তুলনামূলকভাবে অল্প জনসংখ্যার উন্নত দেশে পণ্যসর্বস্ব আনন্দ উপভোগের দিকটিতে সাংস্কৃতিকভাবে জোর দেওয়া হয়। প্রগতি হিসাবে ঘোষণা করা হয় যন্ত্র দিয়ে যে কোন কাজ করিয়ে নেওয়ার দিকটিকে। ফলে মুদীর দোকান থেকে সাধারণ যে কোন অফিসের বহু কাজ কম্পিউটার ভিত্তিক যন্ত্র দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়, যদিও ইভান ইলিচ সহ অন্যান্য চিন্তাবিদরা আগামী দিনের শক্তি সমস্যার পটভূমিতে এই মানসিকতাকে বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

এখানে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। বলা যায় যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিশেষ পরিমন্ডলে প্রযুক্তির এক বিশেষ রূপ হয়। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কম্পিউটার ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কম্পিউটারের মধ্যে কি কি ফারাক করা সম্ভব? সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কম্পিউটার মানুষকে উন্নত সামাজিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রশ্ন হল উৎপাদনের কর্মপদ্ধতির মধ্যে কম্পিউটারের ব্যবহার বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার কি দু ক্ষেত্রে আলাদা? যদি পদ্ধতিগতভাবে তা এক হয়, ব্যবহারিক চিন্তায় তা এক হয়, সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। আবার এক ধরনের সমালোচনায় বলা হয়—কম্পিউটার প্রযুক্তি হিসাবে নিরপেক্ষ। কোন্ ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শের আওতায় তা ব্যবহার হচ্ছে তার উপরই এর সু-বা কু-ব্যবহার নির্ভরশীল। এতে অসুবিধা এই যে যদি কম্পিউটার এক সচল প্রযুক্তি হয়, এবং এর রূপের পরিবর্তন নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ঘটতে থাকে (ধরা যাক "ক" দেশের ক্ষেত্রে তা লাভ-ভিত্তিক বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী, আগ্রাসী সামরিক গোষ্ঠী এবং পুরুষ কর্তৃত্ববাদী গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়), যদি সেই প্রযুক্তি নির্দিষ্ট ভাবে অমানবিক দিকেই এগোতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে এই প্রযুক্তির প্রভাব রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক এলিট গোষ্ঠীগুলির উপর পড়ে তাহলে নানা ধরনের মানসিক-সামাজিক বা অর্থনৈতিক-সামাজিক ঘটনা ঘটতে থাকবে যা এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এখন এই প্রযুক্তিকেই যদি মানবিক ক্ষেত্রে খোল নলচে সমেত ব্যবহার করা হয় (ধরা যাক "খ" দেশে) তবে তা বাস্তবে আদৌ মানবিক হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। প্রশ্নটি এখানে শুধু খারাপ বা ভাল ব্যবহারের নয়। এই ক্ষেত্রে দুটি ধারণার উল্লেখ বেশ জরুরী বলে মনে হয়। প্রথমটি হল, "প্রযুক্তি" কোন পারিপার্শিক থেকে বিচ্ছিন্ন নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ বস্তু নয়! এর গঠন প্রণালী সামগ্রিক সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় গতিপথের সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়টি হল, "প্রযুক্তি" আসলে একটি সম্পর্ক এবং এই ক্ষেত্রে তা হল রাষ্ট্র তথা সমাজ পরিচালনাকারী গোষ্ঠীগুলির সাথে রাষ্ট্রের আওতায় থাকা আপামর জনসাধারণের এক বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের মূর্ত রূপ। তৃতীয় বিশ্ব সংক্রান্ত আলোচনায় আমার মনে হয় এই ধারণাগুলি বারবার ফিরে আসবে।

* * *

গোটা তৃতীয় বিশ্ব জুড়েই কম্পিউটারের উৎপাদন বা ব্যবহার অসম। তাইওয়ান বা দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে অ্যাঙ্গোলা বা মোজাম্বিককে এক করে দেখান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের চারপাশের দেখা জগৎকে ধরেই আলোচনা চালাতে পারি। গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে কম্পিউটারের ব্যবহারে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে বড় ব্যবসায়িক ফার্মের কাজকর্ম যেরকম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তেমন ভাবেই "ম্যানেজারিয়াল মেথড" দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম চালানো সম্ভব কি না? এক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে কম্পিউটারকে সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করাও শুরু হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নীতি হিসাবে এখানে প্রয়োজনভিত্তিক গবেষণার বদলে অগ্রসর দেশগুলি থেকে অত্যাধুনিক মাপের প্রযুক্তি সরাসরি আমদানী করে উন্নত দেশগুলির সাথে এক সারিতে উঠে আসার চেষ্টা করা হয়। বলা হয় গবেষণায় "রিপিটেশন" অর্থহীন। চেষ্টা চলে সরাসরি সুপার কম্পিউটার কেনার।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোর্স ক্যারিকুলাম উন্নত দেশের মাপকাঠিতে তৈরী করে রাতারাতি "টেকনিক্যাল ম্যান-পাওয়ার" তৈরী করা হয়। বাজারে কথা তৈরী হয় যে ভারতীয়রা "সফ্‌টওয়্যারে" খুব দক্ষ। এবং এই ক্ষেত্রে প্রবাসী ভারতীয়দের কৃতিত্বকে তুলে ধরে গর্ব অনুভব করা হয়। লেখায়, স্থিরচিত্রে, বিজ্ঞাপন লে-আউটে ফুটে ওঠে নিত্যনতুন কম্পিউটার-ভিত্তিক এক চকচকে জগতের ছবি। আর তারই পাশাপাশি একই সাথে অবস্থান করে খরা-বন্যা, পানীয় জল আর মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের নিদারুণ অভাব, আন্ত্রিক, শিশুমৃত্যু, দারিদ্র্য সীমার ট্র্যাপিজ খেলা। কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির সামনে বাড়তে থাকে লাইন। কারণ উন্নত দেশের মাপে এখানেও কম্পিউটার সব কাজ করে দেবে। শুধু নানান উন্নয়ন খাতে টাকার অংকই বেড়ে চলে। কারণ, ভয় নেই, কম্পিউটারই সব হিসাব মিলিয়ে দেবে।

এক বন্ধু বলছিলেন যে কম্পিউটার শ্রমবিভাগ উঠিয়ে দেবে। বয়স্ক কিংবা তরুণ, উচ্চবর্ণ কিংবা নিম্নবর্ণ, নারী কিংবা পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই বোতাম টিপলে কম্পিউটার সাড়া দেবে একই ভাবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে কম্পিউটার নামক ক্ষমতার আধারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আর এক ক্ষমতাকেন্দ্রীক স্তরযুক্ত শ্রেণীবিভাগ, পিরামিডের মত। ধরুন যারা কম্পিউটার টেকনোলজি পড়েছেন, উচ্চ শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে আয়ত্ব করেছেন তথ্য সাজানর আর সঠিক নির্দেশ দেওয়ার নানান নিয়ম-কানুন, যারা কম্পিউটার স্থাপত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের আমরা বলতে পারি কম্পিউটার-এলিট। পিরামিডের শীর্ষের দিকে আছেন এঁরা। এও লক্ষ্য করা যায় যে সমস্ত ধরনের অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক এবং মধ্যম বর্গের বুরোক্র্যাটদেরও এখন ঝালিয়ে নিতে হচ্ছে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত কম্পিউটার সংক্রান্ত এক শিক্ষাক্রম (ভাষা, তথ্য সাজান ইত্যাদি)। এঁরা হলেন "কম্পিউটার কসমোপলিটন"। এক নতুন কম্পিউটার সংস্কৃতিতে দ্রুত আত্মস্থ হয়ে উঠছেন এঁরা। কথ্য-ভাষায়ও কম্পিউটার স্ল্যাং ব্যবহার হচ্ছে ইদানীং। উচ্চ-মধ্যবিত্ত আর মধ্য-মধ্যবিত্তদের এই ক্ষীণধারার নীচে অবস্থিত মধ্যবিত্তদের বড় মাপের স্তরগুলিও এখন কম্পিউটারে আগ্রহী। '60 এর দশকে গ্র্যাজুয়েটেরা যেমন স্টেনো-শর্টহ্যান্ড, টাইপিং শেখার জন্য লাইন দিয়েছিলেন আজ সেই রকমই সবাই দৌড়চ্ছেন যে কোন একটা কোর্স করার জন্য, যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে (অবশ্যই পাল্লা দিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত কম্পিউটার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, চারদিকে) আর আরও তলার সাধারণ মানুষরা, যাঁরা কলগেট দিয়ে দাঁত মাজা, বা সার্ফ দিয়ে কাপড়-জামা কাচার মত বিলাসিতার আওতায় আসেননি এখনও (যদিও ফুটপাথে ট্র্যানজিস্টার রেডিও বাজে)—এখানে এসেই অস্বস্তির সঙ্গে নীরবতায় ফিরে যাই আমরা।

আসলে উপযোগিতার তত্ত্বে আমরা সবাই বিশ্বাস করলেও পৃথিবীর এই প্রাচীন অংশে প্রথম বিশ্বের পুঁজিভিত্তিক বা সমাজতান্ত্রিক প্রযুক্তি সরাসরি উপর থেকে বসিয়ে দিলে ফলাফল জটিল থেকে জটিলতর হতে বাধ্য। আমাদের দেশের এলিটরা উন্নত দেশের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় তথা ব্যবসায়িক কাজকর্ম চালাতে চান। আর সেক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের আপাত সুফলে (?) পুরোন উপনিবেশ—যা বহু বছর ধরে পুনরুৎপাদিত করছে তার বর্ণ-ধর্ম-সম্পদ-পুরুষ-কর্তৃত্বভিত্তিক মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি, সেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তির এই দ্রুত এবং অনুকরণ-সমৃদ্ধ ব্যবহার আমাদের প্রগতির অন্তর্বস্তু সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। একটি অনুভূতির কথা বলি। দাঁড়িয়ে ছিলাম ফ্লুরোসেন্ট আলোয় উজ্জ্বল করিডরের শেষ মাথায়, জানালার সামনে। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংকেতের তীব্র আওয়াজ বুঝিয়ে দিল বিদেশী কম্পিউটারের স্পর্শকাতর অবস্থাকে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে বেশ কিছুটা। অনেকটা উঁচু থেকে চোখে পড়ল কর্দমাক্ত রাস্তা, ভ্রষ্টছাঁদ বাড়ীঘর, নগরায়নের অপরিচ্ছন্ন চেহারা সর্বত্র দৃষ্টিকে খোঁচা দেয়। তৃতীয় বিশ্বের মেট্রোপলিস যেন এক অদ্ভুত পিঁজরাখানা, তার রাজপথের মাঝখানে গর্ত, বাতাসে কার্বনের বিষ, শৌচাগার ও নর্দমার ব্যবধানহীনতা, অসংখ্য নোংরা ফুটপাথবাসী, ট্র্যাফিক জ্যাম আর জঞ্জালের স্তূপ। আর তার মধ্যে ঠান্ডা ঘরের কম্পিউটার, যেন আদিগন্ত তৃতীয় বিশ্বর মধ্যে এক টুকরো প্রথম বিশ্বের আকাশ।

যাঁরা বলেন কম্পিউটারের ব্যবহার উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে, সেই উদ্বৃত্ত মূল্যের সাহায্যে উন্নয়ন ঘটিয়ে, স্ব-নিয়োজিত কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করে আমরা প্রথম না হোক দ্বিতীয় বিশ্বে উঠে আসব, কিংবা তাঁরা যাঁরা এই কুৎসিত, নোংরা গন্ধযুক্ত রাস্তাঘাট মাড়িয়ে উঠে যান শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার কক্ষে, পৃথিবীর দিকে পিছন ফিরে ঠোঁট নাড়িয়ে পরিসংখ্যান দেন, কিংবা যাঁরা শ্লোগান দেন আমাদের কম্পিউটার ভাল ওদেরটা খারাপ, এখানে না বসালে অন্য

জায়গায় চলে যাবে, তাঁদের সবার সৃষ্ট ফাঁপা কোলাহলের মধ্য দিয়ে নেমে আসে স্তব্ধতা, আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মহার্ঘ্য প্রযুক্তির সাথে করমর্দনে অস্বস্তি বোধ করি আমরা, হাত পিছনে লুকোই।

* * *

কম্পিউটারের এক মানবিক সমালোচনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাইক্রো কম্পিউটার প্রযুক্তির উদ্ভব, বিকাশ এবং নির্দিষ্ট গতিপথে চালিত হওয়ার ইতিহাস আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যদিও এক্ষেত্রে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এই আলোচনা অনেকটা আগ বাড়িয়ে দেখা বা পশ্চিমের দিকে চেয়ে থাকা মনে হতে পারে। কারণ মাইক্রো কম্পিউটার সৃষ্টি অগ্রসর প্রযুক্তিভিত্তিক সাংস্কৃতিক বাতাবরণের আওতায় এবং বিশেষ ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে। যদিও বড় কম্পিউটার এবং তার যন্ত্রাংশ প্রস্তুতিতে সমর-শিল্প গোষ্ঠীগুলির সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল কিন্তু ক্ষুদে কম্পিউটার প্রস্তুতি সম্ভব হয়েছিল এক জাপানী ক্যালকুলেটর প্রস্তুতকারক সংস্থার প্রয়োজনে। আমেরিকার সিলিকন ভ্যালীতে অবস্থিত ইনটেল কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারদের উৎসাহেই তৈরী হয় প্রোগ্রাম করা সম্ভব এমন এক কম্পিউটার যার মূল অংশ তৈরী হয় এক ছোট্ট সিলিকন টুকরোর উপরে। সামান্য কয়েক ডলার মূল্যে বাজারে ছাড়া সম্ভব এমন এক উৎপাদন, সমস্ত কম্পিউটার জগতে এক আলোড়ন তোলে। অল্পমূল্যের এই শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যা ছাত্র কিংবা যে কোন উৎসাহী ব্যক্তির কাছে সহজলভ্য, হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানবিরোধী, কর্তৃত্ববিরোধী মানুষদের কাছে এক প্রতীক—আই. বি. এম বা বেল কোম্পানীর বিশাল কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে। ফোনের বিল এড়ানয় এর ব্যবহার বা দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বড় নেটওয়ার্কের সংরক্ষিত প্রোগ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার অর্থ বের করা এক ধরনের প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার চেহারা হিসাবে দেখা দেয়। 1974 সালে ইনটেলের 4040 মডেল একটি চিপের উপর একটি মাইক্রো প্রসেসর (যা মাইক্রোকম্পিউটারের মূল অংশ) নিয়ে বাজারে আসায় যেকোন উৎসাহীর পক্ষে নিজস্ব কম্পিউটার গড়ে তেলা সহজ হয়ে পড়ে। যুক্তিবাদী, কর্তৃত্বহীন সংস্কৃতিতে আগ্রহী শখের কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদরা (যাদের "হ্যাকার" নামে অভিহিত করা হয়) কম্পিউটারভিত্তিক ইউটোপিয়ান স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তাঁরা মনে করতে শুরু করেন যে এই সস্তার ক্ষুদে কম্পিউটার তথ্যের বিকেন্দ্রীকরণ করবে। এবং যেহেতু আজকের দিনে তথ্য ক্ষমতার উৎস তাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও ঘটবে।

কিন্তু 1975 সালে পপুলার ইলেকট্রনিকস পত্রিকায় যখন "আলটেয়ার" নামক প্রথম বাণিজ্যিক মাইক্রো কম্পিউটারের কথা প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় যে এর প্রস্তুতকারক যথেষ্ট ফরমাইশ পাচ্ছেন, যদিও এই মডেল সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রযুক্তিবিদদের কাছেই বেশী উপযোগী। এই সময়ই উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ায় গড়ে ওঠে "হোমব্রিউ কম্পিউটার ক্লাব", এক ক্ষমতাবিরোধী গোষ্ঠী। কোন সদস্যপদ বা চাঁদা ছাড়াই এঁরা প্রচার করতে শুরু করেন এক বিনামূল্যের তথ্যপত্র। এঁদের ধারণা ছিল যে এই নতুন প্রযুক্তি সবাই মিলেই ভাগ করে নেওয়া সম্ভব। এটা সাদা চোখে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। কিন্তু এর অংশগ্রহণকারীরা বড় প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন আই. বি. এম, পেন্টাগন বা ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটি) চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট স্পর্শকাতর ছিলেন। এবং মাইক্রোকম্পিউটার জগতের মধ্যে এমন সব মানুষ ছিলেন (যদিও শ্বেতকায়, পুরুষ মধ্যবিত্তরাই সংখ্যায় বেশী) যাঁরা ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধিতার মত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে ওঠা "অ্যাপেল" কম্পিউটারও তৈরী হয় প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে। নিজেদের "ভক্সওয়াগন" বাস বিক্রী করে 'অ্যাপেল' প্রস্তুতকারক ওয়জনিয়াক এবং জবস্ তাঁদের প্রথম পঞ্চাশটি কম্পিউটার তৈরী করেন। 1977 সালে এই মডেলের দ্বিতীয় সংস্করণ এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে স্কুলের বাচ্চরাও তা ব্যবহার করতে পারে। নিয়ম ভেঙে এঁরা প্রকৌশলগত খুঁটিনাটিও প্রকাশ করে দেন যাতে তৃতীয় পক্ষও সহায়ক প্রোগ্রাম বা যন্ত্রাংশ তৈরীর তথ্য সরবরাহ করতে পারে। অ্যাপেল সহ, অন্যান্য সংস্থাদের বিকাশ দ্রুত হয়েছিল কারণ প্রথমদিকে বড় সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি। হিউলেট প্যাকার্ডের মত সংস্থা বাজারে ঢোকে 1980 সালে। আর এক বড় সংস্থা জেরক্স যদিও 1974 সালে নিজস্ব মাইক্রো ডিজাইন করে তবুও অন্য উৎপাদনের ক্ষতি হবার আশংকায় 1981 সাল অবধি তা বড় কম্পিউটারের সমানুপাতিক দরে বিক্রি করে। শেষ অবধি দ্বিধর সাথে বাজারে ঢোকে আই. বি. এম, এবং সেটা সে করে বড় কম্পিউটারের জগতে নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেই। এক্ষেত্রে বিকল্প সংস্কৃতির প্রভাবে আই. বি. এম বাধ্য হয় তার প্রকৌশলগত খুঁটিনাটি বাজারে প্রকাশ করতে। কিন্তু বাজারে ঢোকার সাথে সাথেই আই. বি. এম তা দখল করে নেয়, যদিও তার যন্ত্রাংশ অন্য কোম্পানীর তুলনায় উঁচুদরের ছিল না। এক বছরের মধ্যেই অ্যাপেলকে ছাড়িয়ে যায় সে এবং আই. বি. এম মডেলে ব্যবহার করা যায় না এমন প্রোগ্রাম ক্রমশই অচল হয়ে পড়তে শুরু করে। যদিও ক্ষুদে কম্পিউটারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বশাসিত ইমেজ বিজ্ঞাপনের স্বার্থে বড় কোম্পানীগুলি বজায় রাখতে চায় তবুও এই জগতে বড় কোম্পানিগুলির আধিপত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

এর পাশাপাশি বিকল্প সংস্কৃতির প্রভাবও ফুরিয়ে যায় নি। এর প্রভাবেই অ্যাপেল কোম্পানী দক্ষিণ আফ্রিকায় কম্পিউটার সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। বিকল্প সংস্কৃতির প্রবক্তারা বলছেন যে তাঁরা এর প্রতিষ্ঠান বিরোধী চরিত্র বজায় রাখতে আগ্রহী। কিন্তু বাস্তব অর্থে আমরা এখানে এক টেনসন লক্ষ্য করি। কেন না এই "হ্যাকাররাও" এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এবং তাঁদের এই আন্দোলন গণচরিত্র অর্জন

করতে সক্ষম হচ্ছে না। 1985 সালের মধ্যে 70 লক্ষ আমেরিকান পরিবার কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁদের অর্ধেকও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে যোগসূত্র গড়ে তুলতে সক্ষম নন। কারণ টেলিফোনের মাধ্যমে কম্পিউটার যোগাযোগ যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। আমেরিকাতেও গরীব কালো মানুষরা এই জগতের বাইরে পড়ছেন। গরীব শিশুরা যে স্কুলে পড়ে সেখানে যেহেতু তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে না তাই ভবিষ্যতে তারা কম্পিউটারমুক্ত হবে আশা করা যায়। সাধারণভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রেও ব্রাত্য হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, এমন কি প্রথম বিশ্বেও সমস্যাগুলি জটিল। মুক্তিকামী প্রযুক্তি হিসাবে যা শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত কর্পোরেট পুঁজি গিলে খায়। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি যে আরো কত জটিল তা এই আলোচনা থেকেই অনুমানসাপেক্ষ।

* * *

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কোয়েজের উপন্যাস "শতবর্ষের নিঃসঙ্গতা" কর্নেল অরলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার পিতা "পৃথিবী যে গোল" তা নতুন করে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পুনরাবৃত্তি আমাদের পক্ষে আর করা সম্ভব নয়। ট্রানজিস্টর বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মধ্যেই আমাদের বাঁচতে হবে; প্রশ্নটা হল, প্রযুক্তির পুনর্গঠন নিয়ে। সর্বব্যাপ্ত রাষ্ট্রকাঠামো বা পুঁজিনির্ভর ব্যক্তি মালিকানা যে সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডল গঠন করে তার বদলে আমরা কি চাই বিকল্প সংস্কৃতিভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের? নাকি বিকল্প দুনিয়া গঠনের বিশ্বকোষে "বিশেষজ্ঞ" শব্দটির অর্থ বদলে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের ভিত্তিতে বিকল্প সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখব, যেখানে চাহিদা পুনর্গঠিত হবে, অগ্রাধিকার পুনর্গঠিত হবে, এবং তার ফলে খুঁজে পাওয়া যাবে জাতি-উপজাতি, উচ্চ-নিম্নবর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদাভেদহীন প্রত্যেক রকম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ছাপসহ এক মানবিক প্রযুক্তি। কিন্তু সেই প্রযুক্তি কম্পিউটারের যে রূপ দেবে তাকে কি আর আজকের মাপে "কম্পিউটার" বলা যাবে? স্ট্যাফোর্ড বিয়ার তাঁর চিলির অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিয়েছেন "ডিজাইনিং ফ্রীডম" গ্রন্থে তাতে হয়ত এই জাতীয় চেষ্টারই কিছু ছাপ ছিল কিন্তু আমাদের গোলার্ধে যাঁরা মানবিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিয়ে চিন্তিত তাঁদের কম্পিউটার সমালোচনার পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে এক বিকল্প প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কৃতি যদিও এর রূপরেখা এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, তথা সুদূর।

[প্রবন্ধটির চতুর্থ অংশের মূল আলোচনাটি মাহ্লি রিভিউ পত্রিকার (July-August '87) লেনি সিগাল রচিত "মাইক্রোকম্পিউটার, ফ্রম মুভমেন্ট টু ইনডাস্ট্রি" প্রবন্ধের অতিসংক্ষেপিত ভাবানুবাদ, কিছু মন্তব্য আমার নিজের, লেনী সিগালের উদ্ধৃতিটিও ওই একই প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।—লেঃ]

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

স্বাস্থ্য বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও চেতনার বিকাশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ ও সমাধানের প্রচেষ্টায় আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

- ☐ প্রতি দু মাস অন্তর প্রকাশিত 'জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা' পড়ুন, পড়ান ও প্রচারে সাহায্য করুন।
- ☐ জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনাচক্র এবং প্রদর্শনী সংগঠিত করুন।
- ☐ বহুমুখী গ্রামীন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়তে সাহায্য করুন।
- ☐ রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক উন্নত করুন।

প্রকাশিত হয়েছে: পেটের অসুখ • অপুষ্টি • রোগ প্রতিরোধে টিকা • এসব ওষুধ খাবেন না • কৃমি সংক্রমণ • রক্তাল্পতা • জ্বর • কাশি • জলবাহিত রোগ • মশকবাহিত রোগ • জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা • People's Health Movement—A Manifesto • (প্রতিটি দুই টাকা)। এবং বিশেষ প্রকাশনা 'প্রসঙ্গ ওষুধ' (ছয় টাকা)।

প্রাপ্তিস্থান: কলিকাতা—বুক মার্ক, নিউ বুক সেন্টার, মণীষা গ্রন্থালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী হেলথ এসোসিয়েশন, পিপলস বুক সোসাইটি, কথাশিল্প, শৈব্যা, পুস্তকালয়, পাতিরাম; আগরতলা—জ্ঞান বিচিত্রা।

প্রকাশিত হবে: যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, মানসিক ব্যাধি, প্রসূতি পরিচর্যা, আপনার শিশু কি খাবে, শিশু পরিচর্যা, শিশু রোগ, শিশুর মন, ওষুধ থেকে অসুখ, আপনি যে সব ওষুধ কেনেন ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়।

যোগাযোগের ঠিকানা: কর্মসচিব,
নর্মান বেথুন জনস্বাথ্য আন্দোলন
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
244 বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা-20, (ফোন: 28-9646)

ভারতে নিউক্লিয়ার কর্মসূচীর নানা দিকের পরিচিতি ও সমালোচনা ধারাবাহিক ভাবে রাখছে লেখিকা। আগের লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ-এপ্রিল 1987 সংখ্যায়।

পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প
প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

বিগত কয়েক দশকের প্রচেষ্টাতেও আজ পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। এতাবৎকাল মূলত কিছু সরল পথ ধরে এই মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। যেমন, প্রাথমিক নির্মাণ খরচ, প্ল্যান্ট চালু রাখার খরচ, আর প্ল্যান্টের প্রকৃতি ও তার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল কিছু খরচ। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের খরচের সঙ্গে অন্যান্য, প্রচলিত উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের খরচের তুলনা করার মত হিসাবপত্রের যথেষ্ট অভাব থেকে যায়। কিন্তু শুরু থেকেই প্রচার চালান হয়েছে যে আর্থিক সাশ্রয় পারমাণবিক শক্তির স্বপক্ষে এক জোরালো সমর্থন। প্রধানত এর উপরই ভিত্তি করে বংশগতির উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিসংকট আর দূষণ-সমস্যার মোকাবিলা করতে পারমাণবিক শক্তিকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন মনে করা হয়েছে।

এ প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করতে পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরীক্ষামূলক ভাবে বেশ কিছু রিঅ্যাক্টর বসান হতে থাকে। 1957 সালে ডাবলিনের এক মিটিং-এ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ভারতে এই প্রযুক্তির অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এক পর্যালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী—দেশের আশি শতাংশ কয়লা খনি বিহার আর পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীভূত। ফলে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে দেড় হাজার মাইলেরও বেশী দূরত্বে কয়লা বহন করে নিতে হয়। সরকারকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেই এ ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়েছে, কাজেই এ সমস্ত সুদূর শিল্পাঞ্চলের ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি যথেষ্ট লাভজনক আর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে। ডঃ রামান্নার মতেও এই সমস্ত শিল্পাঞ্চলে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন তাপবিদ্যুতের থেকে কম খরচসাপেক্ষ হবে। অবশেষে এদেশী পরমাণু পন্ডিতদের এই বিশেষ পক্ষপাতমূলক বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশের সামগ্রিক শক্তি উৎপাদন নীতি গড়ে তোলা হয়েছে।

এদেশে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের খরচগুলো নির্ধারণ করেছিলেন আকুয়েল আহমেদ এবং দেবকুমার বসু ও এস. মোহন। আর্থিক সাশ্রয়ের প্রশ্নে এঁদের উত্তর নেতিবাচক। পরবর্তী কালে DAE এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করা সরকারী হিসাব থেকেও দেখা যাচ্ছে, শক্তির বিকল্প উৎস হওয়ার যোগ্যতা পরমাণুর নেই—আর্থনীতিক কারণেই নেই। কিছু কিছু খরচ, যেমন যন্ত্রাংশ নির্মাণ আর মেরামতি, বাড়ি তৈরী, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এগুলো যে কোন পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের জন্যই প্রয়োজন। হয়ত পরিমাণের কিছু হেরফের হয়। কিন্তু পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিক্রিয়া শুরুর আগেই জ্বালানীদন্ড সরবরাহ করতে হয়। যে খরচ অন্য কোন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য জরুরী নয়। তাছাড়া ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে থাকা (রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট) কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও মাল পরিবহনের জন্য যে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত পরিবহন পদ্ধতি চালু করতে হবে তার খরচও আগের থেকে বিন্দুমাত্র কম হবে না।

ভারতে ক্যানাডিয়ান রিঅ্যাক্টর স্থাপন করার ফলে মডারেটর হিসাবে হেভী ওয়াটারের খরচও উল্লেখযোগ্য, মোট চারটি CANDU রিঅ্যাক্টর-এর জন্য (প্রতিটি 230 MW ক্ষমতাসম্পন্ন) বছরে 850 টনেরও বেশী হেভী ওয়াটারের প্রয়োজন। তাছাড়াও প্রতি রিঅ্যাক্টর-এ দৈনিক 60 থেকে 80 কিলোগ্রাম হেভী ওয়াটার অপচয় হয় বিভিন্ন কারণে। বেশ কয়েক বছর আগের হিসাব অনুযায়ীই ভারতে প্রতি টন হেভী ওয়াটার প্রস্তুতির খরচ 50 লক্ষ টাকারও বেশী। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আগামী দু-দশকে ভারতে শক্তি উৎপাদনের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে শুধুমাত্র হেভী ওয়াটার বাবদই খরচ হবে আট হাজার কোটি টাকা। এই সঙ্গে আরো একটা কথাও ভুললে চলবে না—এক একটা রিঅ্যাক্টর-এর গড় আয়ু 25 বছর, অথচ তৈরীর প্রাথমিক খরচ অন্যান্য যে কোন পদ্ধতির শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রকে হার মানায়।

যে কোন রিঅ্যাক্টর-এর ক্ষেত্রে আরও একটা উল্লেখযোগ্য খরচ—তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ উপযুক্ত সুরক্ষিত স্থানে জমা করা। ব্যবহারের পর জ্বালানী রডগুলো থেকে প্লুটোনিয়াম-239 নিষ্কাশন করা হয়, কিন্তু ভীষণ বেশী খরচ সাপেক্ষ বলে, পূর্ণত নয়। অথচ এই মৌলের অর্দ্ধ-জীবনকাল প্রায় 24000 বছর। ফলে অন্ততঃ 240 হাজার বছর (অর্দ্ধ জীবনকালের দশগুণ সময়) একে জীবজগতের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া উচিৎ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান লিলিয়েন্থালের হিসেব অনুযায়ী একটা রিঅ্যাক্টর 25 বছরে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে প্রায় ততটাই ব্যয় করতে হবে উৎপন্ন জঞ্জাল 240 হাজার বছর জমিয়ে রাখতে। অর্থাৎ নীট শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ—শূণ্য। '78 সালে জাস্টিস পার্কারের সরবরাহ করা তথ্য অনুযায়ী কুলিং পন্ড ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস মাধ্যমে এই আবর্জনা জমা রাখার

খরচ টন প্রতি যথাক্রমে 150 হাজার ও 225 হাজার পাউন্ড। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য এই খরচ আন্দাজ করা অসম্ভব। পারমাণবিক বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের সময় DAE এ খরচের উল্লেখও করে নি, হিসাব তো দূরস্থান। অথচ এ সমস্ত হিসাবপত্র ছাড়াই বলা হয়েছিল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ এতই সুলভ হবে যে তা পরিমাপই করতে হবে না! শুরুতে এমনও বিশ্বাস করা হত যে নিউক্লীয় ফিশানের সাহায্য নিলেই দারিদ্র্য থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে। কারণ একমাত্র এ পথেই অল্প সময়ে দেশের শিল্পক্ষেত্রের উন্নতি ঘটা সম্ভব। এ ধারণার প্রবর্তক অবশ্য ভারতীয়রা নয়। উন্নত দেশের ক্লাসরুমে নিউক্লীয় শক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হত, নির্দ্বিধায় ভারতের কর্তাব্যক্তিরা তারই পুনরাবৃত্তি করতেন।

মানবিকতার প্রশ্ন তৈনেও নিউক্লীয় প্রযুক্তিকে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করার সমর্থন খোঁজা হয়েছিল। কারণ একমাত্র এ ভাবেই নাকি মানুষের দৃষ্টি এই বিশাল শক্তির ধ্বংসাত্মক দিক থেকে ফেরান সম্ভব। অথচ এ প্রশ্ন থেকেই যায় যে, উন্নতমানের প্রযুক্তি সমাজের নৈতিক উৎকর্ষ আনে, না, সমাজের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিই প্রযুক্তির উন্নতি ঘটায়?

বিপক্ষের সমস্ত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে 1963 সালে স্বপক্ষের কিছু যুক্তি খাড়া করে এদেশে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথ সুদৃঢ় করা হয়। যুক্তিগুলো সাজান হয়েছিল এভাবে—

1. ট্রম্বের BARC-এ বেশ কিছু বুদ্ধিমান ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনীয়ারের সমাবেশ হয়েছে।

2. জ্বালানী হিসাবে বিহার থেকে ইউরেনিয়াম ও কেরল থেকে থোরিয়াম পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

3. পরীক্ষামূলক স্তরে CIRUS-এর কাজ চালাতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন।

4. অন্যান্য পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের মাত্রা আর সুযোগ হতাশা-ব্যঞ্জক।

5. আর্থিক দিক থেকে এ পদ্ধতি সুবিধাজনক।

6. ফিশান প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভারতবর্ষ শুধুমাত্র শক্তি উৎপাদন ছাড়াও প্রগতিশীল দেশের সাথে তাল মিলিয়ে আরো বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে।

অবশ্য ভাবার বক্তব্য পর্যালোচনা করলে এই 'বৃহত্তর উদ্দেশ্য'টা কি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি একবাক্যে স্বীকার করেছেন—এই কেন্দ্রগুলো একদিকে শক্তি উৎপাদন করবে অন্যদিকে উৎপাদন করবে প্লুটোনিয়াম, যে প্লুটোনিয়াম পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর মূল উপাদান। অবশ্য ভাবা বলেছেন ব্রীডার রিঅ্যাক্টরের জ্বালানী হিসাবে এই প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ভারত কেন, কোন দেশই '81 সালের আগে পর্যন্ত ব্রীডার রিঅ্যাক্টর চালু করার কথা ভাবছিল না। পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের নায়ক রবার্ট ওপেনহেইমারের উক্তি থেকে প্রকৃত পরিস্থিতিটা বোঝা সহজ হয়। তিনি বলেছেন—"আমরা হয়ত শুরুতেই অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করব না। কিন্তু অসংখ্য শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র এমনভাবে তৈরী করব যেগুলো অল্প সময়ের প্রচেষ্টাতেই অস্ত্র উৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। আমরা ক্রমাগত ইউরেনিয়াম জমাব, নিজেদের অগ্রগতি গোপন করব,...সেই সমস্ত জায়গায় কেন্দ্রগুলো স্থাপন করব যেখানে, বিদ্যুতের চাহিদার প্রশ্নের থেকেও বড় কথা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা বেশী সহজ হবে।"

আমাদের দেশে কানাডার সহায়তায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছিল এবং এদেশে CANDU রিঅ্যাক্টারই উপযুক্ত মনে করা হয়েছিল।

কারণ এ পদ্ধতিতে ইউরেনিয়াম বিশুদ্ধ করার জটিল পদ্ধতি এড়ান সম্ভব। তাছাড়াও এর থেকে বেশী প্লুটোনিয়াম পাওয়া সম্ভব। এই সময়ে কানাডাকে না জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গোপন চুক্তিতে তারাপুরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটি প্ল্যান্ট আমদানী অনেককেই আশ্চর্য করে। এর পরেই দেখা গেল তারাপুরে ব্যবহৃত জ্বালানী থেকে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশনের কেন্দ্র স্থাপন করা হল, অর্থাৎ প্লুটোনিয়াম সংগ্রহের পদ্ধতিটি ত্বরান্বিত হল। এই সমস্ত কারণে এবং DAE ও AEC উভয়েরই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার মানসিকতা দেখে, স্বাভাবিক ভাবেই তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। সত্যিই কি তারা ভারতের শক্তি সংকট মেটাতেই আগ্রহী, নাকি বিস্ফোরক প্লুটোনিয়াম দিয়ে পরমাণু বোমা বানানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য? □

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

বি-ও-বি'র সেপ্টে-অক্টো 1987 সংখ্যা প্রেসে দেওয়ার পর দেখা গেল আমাদের আয়ত্তাতীত কয়েকটি কারণে সংখ্যাটি বেরুতে অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। তার উপর দেখা দিল আর্থিক সংকট। দুইয়ের যোগফলে—সংখ্যাটিকে সেপ্টে-অক্টো ও নভে-ডিসে 1987 যুগ্ম সংখ্যা করতে হলো। এর আগেরটিও যুগ্ম সংখ্যা হয়েছিল। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি এই 'ঐতিহ্য' কাটিয়ে উঠতে। গ্রাহকদের গ্রাহকপদের সময়সীমা দুই মাস বাড়িয়ে দেওয়া হবে। সঃ মঃ।

জীবনী আলোচনায়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

রবীন মজুমদার

আবিষ্কারের কাহিনী এবং আবিষ্কারকের জীবন নিয়ে লেখালেখি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আদ্যিকাল থেকেই হয়ে আসছে। এ বিষয়ে প্রকাশিত বাংলা বই-এর সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নয়। তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে এতাবৎ যা কিছু লেখা হয়েছে, তা হয়েছে মূলত শিশু ও কিশোরদের জন্যই। বিজ্ঞানীরা যেন প্রতিভা নিয়েই জন্মান এবং একের পর এক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁদের 'অলৌকিক' প্রতিভা। বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার কোনো চেষ্টাই দেখা যায় না। সাধারণত রচনায় অনুপস্থিত থাকে বিজ্ঞানীর বিকাশের প্রক্রিয়াটি; গুরুত্ব পায় না তাঁর সাধনা, অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিষ্ঠা বা সংগ্রাম। মানুষের সামাজিক ইতিহাস, উৎপাদনী প্রয়োজনের ইতিহাস বা বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট এবং কোনো আবিষ্কারের পেছনে তাদের গুরুত্বের স্বীকৃতি বা আলোচনাও থাকে অনুল্লিখিত, ব্যক্তিবিজ্ঞানীর মানসলোকের ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র উপাদান নিয়েও সেখানে আলোচনার কোনো অবকাশ থাকে না। গবেষণার বাইরে দৈনন্দিন ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় জীবনে কোনো বিশেষ বিজ্ঞানী তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার স্বাক্ষরই বা কিভাবে রাখেন বা রাখেন না তাও যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা দেখা যায় না। এক কথায় বাংলাভাষায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর সাড়ম্বর উপস্থিতি সত্ত্বেও তা নিয়ে সত্যিকার চর্চা গড়ে ওঠেনি।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা বিজ্ঞানীকে এভাবে একক প্রতিভার নিদর্শন হিসেবে দেখার মধ্যে সত্যের চেয়ে ভ্রান্তি অনেক বেশী, সম্পূর্ণতা চাপা পড়ে যায় ক্ষুদ্রাংশ দ্বারা। এ ধরনের রচনায় ঈপ্সিত ফললাভ তো হয়ই না বরং বহুক্ষেত্রেই তা ক্ষতিকারক।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' কিন্তু, অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে হলেও, এই ধারার বা স্রোতের বিপরীতে সযত্ন প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখেছে। বিজ্ঞানী এখানে নিছক প্রতিভা নয়, তাঁরও আছে বিকাশ, সাফল্য, ব্যর্থতা, গুণ এবং দোষ।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' যে সব বিজ্ঞানীর জীবন ও কাজ নিয়ে আলোচনা করেছে, তাতে কিন্তু প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল বিজ্ঞানীর সমাজসচেতনতার দিকটি।

বিভিন্ন যুগে বিজ্ঞানীর সমাজসচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। মোটা দাগে বিষয়টিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে দেখা যায়। প্রাক-শিল্পবিপ্লব যুগে সত্যের খাতিরে চার্চ বা রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করতে পিছপা হননি গ্যালিলিও, ব্রুহে, ব্রুনোরা; ফলে তাঁরা সয়েছেন অত্যাচার যন্ত্রণা, বরণ করেছেন মৃত্যু। শিল্পবিপ্লব-পূর্ববর্তী অধ্যায়ের এই সব বীর বিদ্রোহী বিজ্ঞানীরা সেদিনকার নিরিখে ছিলেন সমাজসচেতন। কেননা সত্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এবং প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে, তাঁরা সামাজিক বিভেদ, অন্যায়, অত্যাচার-শোষণের মূলেই কুঠারাঘাত করতে পেরেছিলেন।.... পরবর্তী অধ্যায়ে প্রায় তিনশো বছর ধরে ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লব ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র কায়েম করেছে। এই পর্যায়ে পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানীরা পেতে থাকেন সমাদর, এমন সমাদর যা আগে কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। বিজ্ঞানচর্চা হল মহিমান্বিত এক পেশা। ধনতন্ত্রের জয়যাত্রায় বিজ্ঞানীরাই ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারিগর। এ যুগের উৎপন্ন ভোগ্যপণ্য অতীত দিনের রাজা বাদশাদের চূড়ান্ত বিলাসিতাকেও ম্লান করে দিল, জীবনযাত্রাকে করে তুলল গতিময়, সহজ, স্বচ্ছন্দ। তাই এ সময়ে বীর বিদ্রোহীর ভূমিকায় বিজ্ঞানীকে সেভাবে নামতে হয়নি (যেমন হয়েছিল আগের যুগে) যদিও অন্যভাবে বিজ্ঞানী থেকেছেন সমাজসচেতন। এই পর্যায়েই শেষ দিকের প্রতিনিধি হিসেবে ফ্যারাডে, ডারউইন, মেন্ডেলিফ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

বিশ শতকে কিন্তু ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে আর এক অধ্যায়। সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার এক নতুন জমিতে সংকটের চেহারা নিয়েছে। বিজ্ঞান সেখানে নিরপেক্ষ-নিরাবয়ব নয়। তারও সংকটের নতুন চেহারা প্রকটিত। কোথাও কোথাও সমাজ ও বিজ্ঞানের সংকট মিলেমিশে একাকার: যেমন পরমাণু অস্ত্র তথা বিশ্বধ্বংসের বিভীষিকা, পরিবেশ দূষণ, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ। এযুগে বিজ্ঞান এক অত্যাবশ্যকীয় সরকারী ক্রিয়াকান্ড। বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন চাকুরে মাত্র। এখন বিজ্ঞানীর আর সেই ব্যাপকতাও নেই, তিনি এখন বিশেষজ্ঞ। বিজ্ঞানের কোনো শাখায় বা উপশাখায় বা উপ-উপশাখায় তাঁর বিচরণ। এসবের মিলিত ফলশ্রুতি এই যে অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাঁর কাজের অথবা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের ফসল কিভাবে সমাজে প্রযুক্ত হচ্ছে সে সম্পর্কে হয় উদাসীন, অথবা নিরুপায় দর্শক, অথবা সুবিধাজনকভাবে আপোষকামী—"আমি তো ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের জন্য দায়ী নই।"

...দেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থাভেদেও আবার সংকটের চেহারায় বা বিজ্ঞানীর ভূমিকায় পার্থক্য আছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায়, সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং তৃতীয় দুনিয়ার দেশে দেশে এর রূপভেদ। এহেন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীর সমাজবোধ নানারকম অর্থ বহন করে। এরকম এক বোলাটে পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের নিরিখ কি হবে, সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানসচেতনতা (যার গুরুত্ব আজ সর্বজনগ্রাহ্য) বলতেই বা কি বোঝাবে এবং বিজ্ঞানীর সমাজসচেতনতাই বা কি দিয়ে

বিচার হবে তা নিরূপণ করা এক কঠিন ব্যাপার। ধর্মধ্বজীদের বিপরীতে গ্যালিলিও বা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সৈনিক ক্যানিজারোর বেলায় অথবা রুশ সমাজতন্ত্রকে মাদাম কুরীর সমর্থনে না হয় তাঁদের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় মিলেছিল। ফরাসী বিপ্লবে ল্যাভোয়সিয়ের গিলোটিন হওয়াকে না হয় অভিজাততন্ত্র দমনের অনুষঙ্গী বলে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, কিন্তু আজ বিজ্ঞানীকে সেরকমভাবে সরাসরি চিহ্নিত করা সহজ নয়। কদাচিৎ দু'এক জনকে দেখা যায় যাঁরা সরাসরি যুদ্ধবাজ (যেমন, এডওয়ার্ড টেলর—হাইড্রোজেন বোমার হোতা) বা সরাসরি ভেদনীতি সমর্থন করেন (যেমন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী উইলিয়াম শকলে, যিনি বলেন—নিগ্রোরা অবশ্যই সাদাদের তুলনায় নিকৃষ্ট)। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিজ্ঞানীর সমাজসচেতনতা চিহ্নিত করা আজ এক দুরূহ ব্যাপার।

তা সত্ত্বেও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বিচার করলে এমন ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানীর দেখা পাওয়াই যায় যিনি বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে উদাসীন নন (হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার ভয়াল রূপ বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞানচর্চা থেকে বের করে এনেছিল), যিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে, সামাজিক শোষণ, অত্যাচার নিরসনে, শান্তির লক্ষ্যে, পরিবেশ সুরক্ষার পক্ষে বিজ্ঞানের ব্যবহারের পক্ষপাতী। যথেষ্টই ঝুঁকি নিয়ে তিনি এ প্রয়াস চালিয়ে যান। হয়তো বঞ্চিত হন খ্যাতি-প্রতিপত্তি, অনুদান, সরকারী অনুগ্রহ থেকে, এমনকি হয়তো তাঁকে জীবনও দিতে হয় (থাইল্যান্ডের পরিবেশ বিজ্ঞানী ডঃ নার্ট তুংতাভীরুন বড় বাঁধ তৈরির প্রকল্পের বিরোধিতা করেন, সম্ভ্রীক খুন হয়েছেন তিনি—বি ও বি নভেম্বর-ডিসেম্বর 1986 দ্রষ্টব্য।) 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সেরকম প্রতিবাদী সচেতন বিজ্ঞানীদের জীবন ও কাজ পর্যালোচনার সযত্ন প্রয়াস চালিয়েছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে খুঁজেছে সেইসব বিজ্ঞানীদের—যারা আছে মানুষের কাছে, মাটির কাছে।

তা বলে এই প্রয়াসে কোন ঘাটতি বা দুর্বলতা নেই, এমন অবশ্যই বলা যাবে না। সংশ্লিষ্ট রচনাপঞ্জীটি (দশ বছরের) দেখলেই বোঝা যাবে ঘাটতি বা ফাঁক অনেক। বার্নালকে নিয়ে সেমিনার হয়েছে, তার খবর আছে, কিন্তু তাঁকে নিয়ে একটু বিশদে আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। জগদীশচন্দ্র, সত্যেন বোস, রামানুজনের মনোরাজ্যে উঁকি দেওয়াটা যথেষ্ট কৌতূহলের, কিন্তু তা তাঁদের কাজের সামগ্রিক পর্যালোচনার বিকল্প হতে পারে না। জে. বি. এস. হ্যালডেন, মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর'রা ধরা দেন নি। ইত্যাদি। তবুও মোটের উপর বোধহয় বলাই যায় যে বিজ্ঞানীদের কাজ ও জীবন নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' বাংলাভাষায় একটি বিশিষ্ট ধারার সংযোজন করতে পেরেছে। অদূর ভবিষ্যতে ফাঁকফোকর পূরণ করে একটি সম্পাদিত গ্রন্থিত সংকলন প্রকাশের আশা করা কি খুব বাড়াবাড়ি হবে?

[বি-ও-বি'তে জীবনীমূলক রচনার সূচী, পৃঃ 18]

মনুষ্যকৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয়

কুমারেশ মিত্র

অগত্যা পিছিয়ে গেলাম খানিকটা। মাত্র দশ বছর অতীত, বিস্মৃত অনেকটাই। আতি-পাতি করে খুঁজে আনা পুরোনো বি-ও-বি নিয়ে এক বিষয়ে সাজানো প্রবন্ধগুলোয় গ্রন্থিত মালার সমগ্রে বিস্মিত (!) হ'লাম। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে, পুরোনো আচার অনেক উপাদেয়। সুধী পাঠক, পাঠিকে, এ হেন রসবোধে মাপ করবেন। কেননা, বিষয়টা হ'ল হ্যাজার্ডস। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক-এর পিছনে হাত কার, মানুষের না প্রকৃতির? যদি উভয়েরই হয়, মূল আসামীকে কাঠগড়ায় সনাক্তকরণ করতে হবে।

একবার ভেবে দেখুন তো 1978 সালে সেই প্রলয়ংকরী বন্যার দিন-গুলোর কথা। টাল-মাটাল কলকাতার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে কয়েক দিন কলকাতা ঘুমিয়েছিল অভূতপূর্ব বন্যা ও বৃষ্টির জলের নীচে, বাইরের দুনিয়া ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সমগ্র দক্ষিণ বাংলার নদীর উজানে শুধু জল আর জল, মৃত মানুষের হাজার হাজার গলিতশব, মাটির বাড়ী নিশ্চিহ্ন স্রোতের টানে। দক্ষিণ বাংলার প্রায় সব নদীই একসঙ্গে প্লাবিত। বন্যার মত তাৎক্ষণিক ভয়ংকরী না হলেও দঃ বাংলার জেলায় জেলায় সবুজ ঘাসের ফুসফুসে ধিকিধিকি জেগে ওঠা 1982 সালের বিষম খরার করাল আক্রমণের কথা আরেকবার ভেবে দেখুন। এই বিপর্যয়ের সময়েই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংহা জেগে উঠেছিল তার সমস্ত সীমিত শক্তি নিয়ে। শুরু হয়ে ছিল নদী ও খরা নিয়ে কিছু বৈজ্ঞানিক, ইনটেলেকচুয়াল অনুসন্ধান, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কিছু গ্রাম সমীক্ষা, গভীর অধ্যয়ন, সেমিনার, মিছিল থেকে পোস্টার প্রদর্শনী, কিছু স্লাইড্ শো। প্রতিশ্রুতি ছিল ভুক্তভোগী, অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে, সব রকম সাহায্যের। তারই ফসল আলোকিত কিছু প্রবন্ধ আবার নতুন করে পড়ে নিলাম বি-ও-বি'র পাতা থেকে। .....বিজ্ঞান-সমাজ বিষয়ক দ্বিমাত্রিক সংস্কৃতির জগতে এক অনন্য সংযোজন।

নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকার নদনদী, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অজয়, রূপনারায়ণ, দামোদর ও হুগলীর এবং তার শাখা-ও উপনদীর ঝড়ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত, জলপ্রবাহ, পলি-পতন ও জল-মগ্নতার সমস্যা, এক কথায় বন্যা-সমস্যার এক নিটোল সার্বিক বিবরণ খুঁজে পেলাম অমল সোম, পার্থ সেন, কে. মিত্র লিখিত প্রবন্ধে (বি-ও-বি, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী,

1979)। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা নিজেদের বাণিজ্যিক মুনাফার ও প্রশাসনিক স্বার্থে ভারতবর্ষে জলপথের বদলে রেল-সড়কের প্রসার ঘটিয়েছিল, নদীবক্ষে বড় বড় বাঁধ দিয়ে ও পোস্তা-দেওয়া ব্রীজ নির্মাণ করে। ফলে নদীর নাব্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়ে বন্যার ভয়াবহতা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। প্রকৃতি ও জনসাধারণ থেকে বিযুক্ত (alienated) এক-শ্রেণীর পরিকল্পনাকার, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার নদ-নদীর ব্যাপারে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে ছিন্ন-ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন বিবেচনা ও প্রকল্প গড়ে তুলে বাংলার নদ-নদী-বিন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষের সুষ্ঠু-সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন সেচ-ব্যবস্থার ধ্বংস-সাধন, নদীর নাব্যতা নাশ ও জল-নিকাশীব্যবস্থার দুর্বলতা-সাধন সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। ব্রিটিশোত্তর স্বাধীন ভারত সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে। স্বাধীন ভারতে সবচেয় বিতর্কিত বহুমুখী নদী-প্রকল্প দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধনিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে পরস্পর-বিরোধী প্রকল্প (যেমন সেচ-ব্যবস্থা, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পের জন্য জল সরবরাহ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) গৃহীত হওয়ায় নিম্ন বাংলার নদী অনেক বেশী বন্যা-প্রবণ হয়েপড়েছে(বি ও বি, মার্চ-এপ্রিল, 1979)। এই ফলশ্রুতিতে 1978 সালে কলকাতা সহ প্রায় সমগ্র নিম্ন বাংলা বন্যার জলে ভেসে গেল। এর জন্যে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প কম দায়ী নয়, সে কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক শিবরাম বেরা তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধে (বি ও বি, মে-জুন, ও বি ও বি, সেপ্ট-অক্টোঃ, 1980), বৈজ্ঞানিক যুক্তিরই বাতাবরণে। সব দিক বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে, উচ্চ ফলনশীল চাষের তাগিদের মত আমাদের দেশের কিছু মানুষের কায়েমী স্বার্থই নদীকে অনেক বেশী বন্যা ও বিপর্যয় প্রবণ করে তুলেছে।

খরা বন্যার ঠিক উল্টো। খরা মানে অনাবৃষ্টি (!), অনিয়মিত বৃষ্টি, খরা মানে জলাভাব—সেচ ও পানীয়ের। মানুষের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, সংস্কৃতিক জীবন ভেঙ্গে-চুরে দেওয়া এক চরম দুর্বিপাক—নয়া উপনিবেশবাদী শ্রেণী শোষণেরই ফল (বি-ও-বি খরা-সংখ্যা, জানুঃ-ফেব্রুঃ, 1983তে মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও রবীন চক্রবর্তী লিখিত প্রবন্ধ)। আফ্রিকার ছোট্ট দেশ জাইরেকে নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণের জাতাকলে বেঁধে ফেলার উদ্দেশ্যে বিগত ষাটের দশকেই জনগণের খাদ্যাভ্যাসের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কৃত্রিম উপায়ে খরা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল (নীলাঞ্জন দত্ত, বি-ও-বি, নভেঃ-ডিসেঃ, 1986)।

আটাত্তরের বিধ্বংসী বন্যার পরের বছর থেকেই খরার করাল থাবা পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় ক্রমান্বয়ে প্রসারিত। 1982 হল চরম খরার ক্লাইম্যাক্স। বি-ও-বি'র খরা সংখ্যায় পুরুলিয়ার 1982র চরম খরার বিবরণ ধরা পড়েছে মহাদেব হাঁসদার কলমে ও তাপস মিত্রের লেখায়। শ্রী মিত্র পুরুলিয়ার খরা তথ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন, এর পিছনের বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেছেন। সবচেয়ে চমকপ্রদ কাজ করেছে অসীম চট্টোপাধ্যায় নীলাঞ্জন দত্ত, শাশ্বতী ঘোষ, কৌশিক ব্যানার্জী ও কুণাল চট্টোপাধ্যায়। 1982র খরা নিয়ে বাঁকুড়া ও নদীয়ায় এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ গ্রাম-সমীক্ষা সমাজ ও বিজ্ঞান-সচেতন মানুষের ছাপ বহন করে আনে, বি ও বি'র খরা-সংখ্যা আলোকিত থাকে। প্রদীপ দত্তর পঃ বঙ্গ ও সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে খরা ভাবনা (বি-ও-বি মার্চ-জুন, '86 ও জুলাই আগস্ট, '86) যেমনই তথ্য নির্ভর তেমনই ব্যাখ্যামূলক। সুধী পাঠক, লেখাগুলো আবার নতুন করে পড়ুন, বলতে পারি—ভালো লাগবে।

বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুধু কোনো আঞ্চলিক ঘটনা নয়—বুভুক্ষু মানুষের দুনিয়ায় তার নিত্য উপস্থিতি। তাই আন্ত-র্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতির নাগপাশে বাঁধা। সাম্রাজ্যবাদী মূলধন কিভাবে আফ্রিকার দেশগুলোর ওপর মনোকালচার ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে খরা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে আফ্রিকাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, তার জ্বলন্ত, সুতীক্ষ্ণ, বিশ্লেষণী বিবরণ মেলে নীলাঞ্জন দত্তর লেখায় (বি-ও-বি, নভেঃ-ডিসেঃ, 1936)। এরকম দুর্ধর্ষ লেখা বারবার পড়তে হয়। পড়তে ভালো লাগে, বুঝতে অসুবিধা হয় না খরা বন্যার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ থেকে দিশী ধনিক গোষ্ঠীর এবং তাদেরই সহচর জনগণবিচ্ছিন্ন কিছু বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাকারই মূল আসামী।

শেষমেষ :

কোনো কোনো পাশ্চাত্য দুর্বিপাক বিশেষজ্ঞ (যেমন পল সুসমান ফিল্ ওকিফ, বেন উইসনু) দেখিয়েছেন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ সারা পৃথিবী জুড়ে গত কয়েক দশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ও আনুষঙ্গিক ধ্বংসের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, যদিও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জিও-ফিজিক্যাল প্রক্রিয়ার অবুধবন, নিয়ন্ত্রণ, প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও আনুষঙ্গিক ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে পৃথিবী জুড়ে অভূতপূর্ব শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত হয়েছে। ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, খরার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে দামোদর উপত্যকার মত প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় দেখা হয়েছে মূলত প্রকৃতির শক্তিজাত এক চরম অবস্থা (extreme), প্রকৃতির খামখেয়াল বা দৈব-দুর্ঘটনা হিসাবে। প্রতিষ্ঠানিক ও সরকারী তারকা বিজ্ঞানীদের আস্থা আছে শুধু সমাজ-বিযুক্ত বিশাল বিশাল জিওফিজিক্যাল্, জিওটেকনিক্যাল ম্যানেজারী কর্মকাণ্ডে, মানুষের ওপর নয়। এই সব প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারার বিপুল পরিবর্তন না ঘটালে, মানব সমাজের আরও বেশী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সত্তর দশকে বার্টন প্রমুখ কয়েকজন মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য দুর্বিপাক-বিশেষজ্ঞ দেখান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আবির্ভাব ঘটে প্রকৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। বেশীরভাগ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও আনুষাঙ্গিক ধ্বংস ক্ষমতা মূলত দুর্ঘটনা হওয়ার বদলে মানুষের সমাজ, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও দুর্ঘটনার স্থানের বৈশিষ্ট্যই নির্দেশ করে, মানুষ ছাড়া বিপর্যয়ের ধারণা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে পশ্চিম বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকায় বন্যার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনিবার্যতার ভবিষ্যদ্বাণী সহজেই করা যায়। বরং জটিল মানব সমাজের কোনো উত্থানপতন, আকস্মিক পরিবর্তনের খবর আগে ভাগে বলে দেওয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত বলেই মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন মাত্রার বিপর্যয়ের শিকার হয়। গরীব মানুষের বিপর্যয় প্রবণতা ধনিক শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশী। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা করতে হলে আমাদের মানব সমাজের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে গভীর অন্বেষণ চালাতে হবে।

আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতা ও তার প্রযুক্তি প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভারসাম্য রক্ষাকারী সমস্ত ট্র্যাডিশনাল ব্যবস্থাপনার দ্রুত ধ্বংস-সাধন ঘটিয়ে চলেছে। দিশী ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত মানুষই খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মূল আসামী। তাই প্রকৃতি ও সমাজ-বিযুক্ত বিশাল বিশাল আধুনিক প্রকল্পের বদলে খরা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে অসংখ্য ছোট ছোট ড্যাম তৈরী করে, সবুজ ঘাস ও বনানীর আচ্ছাদন আরও বিস্তৃত করে, কৃত্রিম উপায়ে ও আলের সাহায্যে ভূগর্ভে জলের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যয়-প্রবণ মানবগোষ্ঠীর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে ও সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়েই প্রকৃতি ও মানুষের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।

বি-ও-বি তে সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর 1983, যুগ্ম সংখ্যাটির বিষয়বস্তু ছিল মন-মনরোগ-মনোবিজ্ঞান। বি-ও-বি'র দশ বছর পূর্তিত এই বিশেষ সংখ্যাটির মূল্যায়ন—

বি-ও-বি'তে 'মন'

অমল সোম

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র 'মন, মনোরোগ, মনোবিজ্ঞান' সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যাটির প্রায় বছর চারেক পর পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মনে আসে তা হল, সংখ্যাটিকে ঘিরে পাঠকদের মনে আগাম যে উৎসাহ, আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল এটা তা' পূর্ণ করতে পেরেছিল কি না। সম্ভবত পাঠকরা নিরাশই হয়েছিলেন, কারণ এই বিশেষ সংখ্যায় না মন, না মনোরোগ, না মনোবিজ্ঞান কোনো বিষয়েই পাঠকদের মনে আলোকপাত করার মত, ছাপ ফেলার মত কিছুই নেই। কি আছে তাহলে সংখ্যাটিতে? আছে শুধু মনোচিকিৎসা বা সাইকিয়াট্রির প্রতি কিছু জ্বালা, কিছু প্রতিবাদ ও অভিমান। আছে বিকল হয়ে যাওয়া মানবমনের প্রতি বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে চরম ক্ষুব্ধ কিছু কথা; কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত বা তথ্যনিষ্ঠভাবে সেসব কথাগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। ভাবোদ্গারের, অনেকটাই নিষ্ফল আক্রোশের, সুরে রচিত হয়েছে 'পাগলভাবনা' নামে প্রবন্ধটি এবং 'অবদমন' শব্দটি এই বিশেষ সংখ্যায় বিবিধ লেখার মধ্যে কমপালসিভ অবসেশনের মতই বিচরমান।

এদেশে মনোরোগ বা মনোবিজ্ঞান নিয়ে চর্চার ইতিহাস বা বর্তমান অবস্থার কোনো পরিচয়ই এই সংখ্যাটির মধ্যে নেই। লক্ষণীয়, সমস্ত ঘটনা ও তথ্যের উল্লেখ—এমনকি পুস্তকপরিচিতির সবই বিদেশী। উন্নত দেশগুলোতে মানুষের সার্বিক আত্মিক মুক্তির যে আন্দোলন—যা মানসিক রোগীদেরও বাদ দেয় না—তাদের প্রতিবাদকেও দেয় সাংগঠনিক রূপ—এইসব শ্লাঘনীয় উদাহরণ আমাদের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কতটা প্রাসঙ্গিক—এ প্রশ্ন সততই মনে জাগে সংখ্যাটি পড়তে পড়তে।

বিশেষ সংখ্যায় বিশেষভাবে যা থাকলে মনে হয় ভাল হত—তাই বলেই এই পশ্চাদবলোকন শেষ করি:

(1) মন কি? এ সম্বন্ধে বর্তমানে মনোবিজ্ঞান, নিউরোসায়েন্স, শারীরবিজ্ঞান কি বলে—এর পরিচয়। ফ্রয়েডের সিস্টেমেটিস মন সম্বন্ধে পরবর্তী নিও-ফ্রয়েডিয়ানদেরই বা কি অভিমত এবং এই সবগুলোই বিশেষ করে আমাদের শিল্প সাহিত্যে এবং মধ্যবিত্ত তথা উর্ধ্বতর শ্রেণীদের মানস চেতনায় কিভাবে বিম্বিত হয়েছে এবং হচ্ছে কি? স্বাভাবিকভাবেই তাহলে আসবে তথাকথিত পাভ্লভীয়ান স্কুলের মন সম্বন্ধে কি বক্তব্য এবং পাভ্লভ-উত্তর সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানীদের কি অবদান—তারও আলোচনা।

(2) মনোরোগ ব্যাপারে বিভিন্ন মডেলগুলোর আলোচনা, রোগ-চিকিৎসার একটা ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান ব্যবস্থাগুলো কি? সেগুলো বিবৃত করে তারপর তাদের সমালোচনা।

(3) যে আলোচনা খুবই জরুরী হয়ে পড়ছে:—শিশুদের মন এই বৈষম্যমূলক, চরম স্বার্থবাদী সমাজে কিভাবে বিকশিত হচ্ছে এবং বড়রা কিভাবে নিজেরাই শিশুদের মনে আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থভাবনার বীজগুলো পুঁতে দিয়ে তারপর সেইসব স্বরোপিত বিষবৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছে।

(4) 'মানস' নামক সংস্থাটির কার্যকলাপের সারসংকলন, চিন্তা অভিজ্ঞতার আরও বিস্তৃত পরিচয় থাকলে ভাল হত। কারণ বিশেষ সংখ্যাটির 'শেষের কথা'য় আছে 'মানস' চায় মহাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কচকচি নয়, বাস্তব মানুষের মানসিক সমস্যা ঘিরে আরো আরো বাস্তব মানুষের যে মানসিক সমস্যাগুলো হয় তা নিয়ে সম্মিলিত প্রয়াসে কিছু 'সুরাহা' করতে। 'মানস' 'কাজ' করে কি পেল? কিছু পেয়েছি কি? পাওয়া সম্ভব কি? এই প্রশ্নগুলো রইলো—যদি ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত কোনো বিশেষ সংখ্যা বেরোয় আবার, সেজন্য।

পরিবেশ দূষণ
আলোচনায়
বি-ও-বি

পার্থ সেন

বনাঞ্চল ধ্বংস করে গড়ে উঠেছে জনপদ। নদী-নালা-অরণ্য প্রকৃতির সমগ্র সম্পদে মানুষের আধিপত্যের ছাপ, মানুষের জয়যাত্রার নিশান উড়িয়ে গড়ে উঠেছে কল-কারখানা। এই অগ্রগতির সঙ্গেই যে বিপদের সঙ্কেত ছিল তা নিয়ে ভাবার অবকাশ সময়ের তাগিদেই ছিল অনুপস্থিত। নগর সভ্যতার পাকাপাকি গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দূষণ শব্দটি নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী হিসেবে। মুনাফার তাগিদে শিল্পের যথেচ্ছ এবং অপরিকল্পিত রূপায়ণ জল-বায়ু-প্রকৃতিকে করেছে অসম্ভব রকমের দূষিত। ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শত সহস্র মানুষ। মিনামাতা থেকে ভূপাল—এক দুঃসহ স্মৃতি এই শতকের। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো জনগোষ্ঠী—কি পাশ্চাত্যের কি প্রাচ্যের-দূষণের কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের দূষণ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ এখন প্রাচ্যের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বিভিন্ন দেশে দূষণ-বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে, আলাদা করে সরকারে দূষণ-বিরোধী মন্ত্রক স্থাপন করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে পরিবেশ আন্দোলনকারীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিল সে দেশের সরকার। পরিবেশ আন্দোলনকারীদের রাস্তায় ফুল ছড়ানো ছিল না। কারেন সিলকউড আর তুঁতাভীরুন প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এই আন্দোলনকে কিভাকে প্রতিহত করতে চায়। গ্রীন পার্টির সতর্ক প্রহরা সহ্য করে নি এমনকি তথাকথিত প্রগতিশীল মিতেরাঁ সরকার। ইউনিয়ন কার্বাইডের মামলার শুনানী স্থির হয়েছে ভারতবর্ষে—ক্ষতিপূরণের মাত্রা কমিয়ে দেওয়ার তাগিদে।

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা এখনও শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। চিপকো আন্দোলন, সাইলেণ্ট ভ্যালী সংরক্ষণ আন্দোলন, বিভিন্ন গণ বিজ্ঞান সংগঠনের আন্দোলন গত দশ বছর নিঃসন্দেহে বি-ও-বি'কে উৎসাহ যুগিয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা তেমন গুরুত্ব পায় নি। পরবর্তী-কালে চেষ্টা করা হয়েছে এই বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে। প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে পরিবেশ দূষণের প্রকৃতি ও দূষণ-বিরোধী আন্দোলন। আমাদের দেশের পরিবেশ দূষণ স্বভাবতই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। একদিকে যেমন বিদেশ থেকে রাসায়নিক বিপদ আমদানি করার বিরুদ্ধে আমরা নিবন্ধ প্রকাশ করেছি, তেমনি পেস্টিসাইডের অপপ্রয়োগ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে। আবার আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কলকাতার জল-বায়ু দূষণ হাজির করা হয়েছে পাঠকদের সামনে। হিন্দুস্তান জিঙ্ক থেকে খড়দহ-টিটাগড়-ত্রিবেণী-সুন্দরবনে কল-কারখানার দূষণ কিভাবে ধ্বংস করছে এবং করবে আমাদের জনজীবন—সেসব তথ্যও পেশ করা হয়েছে। এই গ্রহের যে কোনো অংশের দূষণেই যে সমগ্র মানবজাতির ক্ষতি—সেই কথা মনে রেখে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মিনামাতা-ইতালি চের্নোবিল আমাদের ভাবিয়েছে। পরিবেশ নিয়ে যখন চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে তখনই ডিসেম্বরের সেই কালো রাত্রি ভূপাল শহরে যে মৃত্যুর হাতছানি দিয়েছিল তা সকলকেই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। দেশের ভেতরে জোরালো প্রতিবাদের সময় উপস্থিত ছিল। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম নির্বাচনী বক্তৃতায় যাঁরা উঠতে বসতে বহুজাতিক সংস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তাঁরা নামকা-ওয়াস্তে বিষয়টি লোকসভায় উত্থাপন করে বিবেকের দায় থেকে বাঁচলেন। আর ফিরেও তাকালেন না সেই অসহায় গ্যাস-পীড়িত মানুষদের দিকে। আশার কথা, ছোট ছোট গোষ্ঠী ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে গ্যাস-পীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু করার কথা ভেবেছেন—করতে পেরেছেন সামান্যই। আমরা সাধ্যমত প্রচার করার চেষ্টা করেছি চরমতম দূষণের এই কলঙ্ক। ভূপালের ঘটনা আমাদের নতুন করে ভাবিয়েছে কেশোরাম রেয়ন (ত্রিবেণী), হিন্দুস্তান হেভি কেমিক্যাল্‌স (খড়দহ), দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের দূষণ সম্পর্কে—যে সব অঞ্চল যে কোনোদিন আর একটি ভূপাল হয়ে উঠতে পারে। কারখানা-জাত দূষণ ছাড়াও পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে নির্দিষ্ট পদার্থের দূষণ সম্পর্কিত নিবন্ধ। যদিও নির্দিষ্ট কারখানায় দূষণ সমীক্ষাই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি।

দূষণ প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে পত্রিকার পাতায়। কেশোরাম রেয়নের চারপাশের মানুষ দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, আজ প্রায় পঁচিশ বছর। সুরাহা হয়েছে খুবই কম। মথুরাপুরে প্রস্তাবিত সার কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে গঠিত হয়েছে দূষণ প্রতিরোধ কমিটি। লড়াই চালিয়ে যেতে তারাও বদ্ধপরিকর।

দূষণ বিরোধী আইন সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ আমরা প্রকাশ করতে পারি নি। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের দুর্বলতা।

এ সব সত্ত্বেও কেশোরাম রেয়নের শিল্পজাত দূষণ-বিরোধী গ্যাস-কমিটি থেকে মথুরাপুরে দূষণ প্রতিরোধ কমিটির এই পঁচিশ বছরের পরিক্রমায় আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি। জানি না সার্থক হয়েছি কিনা—সে বিচারের ভার আপনাদের। যাত্রার ত'

কোনো শেষ নেই। যাত্রা দিয়েই শুরু আবার শেষেও যাত্রা।

গত দশ বছরে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত যে সমস্ত নিবন্ধ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকাটি নিচে দেওয়া হল ঃ

রাসায়নিক বিপদ আমদানি ।। রবীন মজুমদার ।। দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নভেঃ-ডিসেঃ, 1978, পৃঃ 7-9 □ শিল্প আবহাওয়া দূষীকরণ ঃ একটি সমীক্ষা ।। পার্থ সেন ।। তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুঃ-ফেব্রুঃ, 1980, পৃঃ 13-15 □ পেস্টিসাইডের অপপ্রয়োগ ও আমাদের ভবিষ্যৎ ।। মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ।। চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, 1980, পৃঃ 3-6 □ শিল্পে পরিবেশ ও শ্রমিক স্বাস্থ্য ।। রবীন চক্রবর্তী ।। চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, 1980, পৃঃ 7-10 □ পেস্টিসাইডের অপপ্রয়োগ ও আমাদের ভবিষ্যৎ ।। মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ।। চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেঃ-অক্টোঃ, 1980, পৃঃ 2-6 □ কলকাতার জল-বায়ু দূষণ ।। কুমারেশ মিত্র ।। চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, 1981, পৃঃ 2-6 □ শিল্পাঞ্চলের আবর্জনা গ্রামকেও দূষিত করছে ।। সন্ধানী ।। পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, 1981, পৃঃ 15 □ কার্বন ডাই অক্সাইড দূষণ ও পশ্চিমী প্রকৃতিবাদ ।। সন্ধানী ।। পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা নভেঃ-ডিসেঃ, 1981, পৃঃ 15 □ কীটনাশক না জননাশক ? ।। সন্ধানী ।। পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, 1982, পৃঃ 13 □ ভূপালের ডায়েরী—চিকিৎসাচিত্র ।। ডাঃ সুজিত কুমার দাস ।। অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুঃ-ফেব্রুঃ, 1985, পৃঃ 9-10 □ ভূপালের সম্ভাবনা—দেশে দেশে ।। সংগৃহীত ।। অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুঃ-ফেব্রুঃ, 1985, পৃঃ 11-12 □ জনস্বাস্থ্য বনাম কীটনাশক ।। সুব্রত শীল। অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, 1985, পৃঃ 13-15 □ ঘরের কাছে দূষণ ঃ কেশোরাম রেয়ন ।। শান্তনু ত্রিবেদী ।। অষ্টম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা ও নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট, 1985, পৃঃ 2-4 □ মিনামাতা ।। পার্থ সেন ।। অষ্টম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা ও নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট, 1985 পৃঃ 21-24 □ গ্যাস আর ছাইয়ের কবলে খড়দহ-টিটাগড় ।। শান্তনু ত্রিবেদী ।। নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নভেঃ-ডিসেঃ, 1985, পৃঃ 3-4 □ ভূপালে চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াই ।। পুণ্যব্রত গুণ ।। নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নভেঃ-ডিসেঃ, 1985, পৃঃ 5-7 □ পরিবেশের খবর : দূষণের দায়ে অভিযুক্ত বিড়লা গোষ্ঠী ; নিউক্লিয়ার চীন ও সুদান ।। নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুঃ-ফেব্রু, 1986, পৃঃ 23 □ ভূপাল যেদিন হ'ল এবং তারপর ।। শিবপ্রসাদ নিয়োগী ।। নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুঃ-ফেব্রুঃ, 1936, পৃঃ 1-2 □ রাসায়নিক কারখানার দূষণে এবার সুন্দরবন ।। সৌমেন গুহ ।। নবম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যা, মার্চ-জুন, 1986, পৃঃ 18-22 □ হিন্দুস্তান হেভি কেমিক্যালস—বাতাসে বিষগ্যাস জলে পারদ ।। শান্তনু ত্রিবেদী ও পার্থ সেন ।। নবম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ-জুন, 1986, পৃঃ 25-27 □ কেশোরাম ও হিন্দুস্তান হেভি-কেমিক্যালস-এর দূষণ সমীক্ষা ।। পার্থ সেন ।। দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, 1986, পৃঃ 17-18 □ ভূপাল মামলা ।। রবীন চক্রবর্তী ।। দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, 1986, পৃঃ 15-16 □ চের্নোবিল ।। সুপর্ণ চৌধুরী ।। দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, 1986, পৃঃ 19-23 □ কার্বন ডাই-সালফাইড দূষণ ।। অরবিন্দ দাস ।। দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেঃ-অক্টোঃ, 1986, পৃঃ 15-16 □ সুন্দরবনে সার কারখানা—আর একবার ভাবুন ।। শান্তনু ত্রিবেদী ।। দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টে-অক্টোঃ, 1986, পৃঃ 19-20 □ সায়ানাইড আর পারদ বিষে ধুঁকছে দুর্গাপুর ।। শান্তনু ত্রিবেদী ।। দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নভেঃ-ডিসেঃ, 1986, পৃঃ 15-16 □ পরিবেশ বিজ্ঞানী তুঁতাভীরুন সস্ত্রীক খুন হলেন ।। দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নভেঃ-ডিসেঃ, 1986, পৃঃ 18 □ ভারতের বনচিত্র ।। গৌতমবুদ্ধ রায় ।। দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানু-ফেব্রু, 1987, পৃঃ 11-12 □ সুন্দরবন সার প্রকল্প—প্রকল্প বিরোধিতা—একটি দৃষ্টান্ত ।। র. চ. ।। দশম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, 1987, পৃঃ 20।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে প্রকাশিত জীবনীমূলক রচনা

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (1987-1955)	শান্তনু দত্ত	মার্চ-এপ্রিল, 1979
বার্ণালের আশীতম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ সভা	সুনীল মুখোপাধ্যায়	মে-জুন, 1981
জীবনালেখ্য ঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	সৌমেন গুহ	মে-জুন, 1981
এক বাঙালী রসায়নবিদের আত্মচরিত থেকে	পার্থ সেন	জুলাই-আগস্ট, 1981
মাইকেল ফ্যারাডের জীবন ও সময়	রবীন মজুমদার	নভেঃ-ডিসেঃ, 1981
বার্নালের আশীতম জন্মবার্ষিকী		নভেঃ-ডিসেঃ, 1982
দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী ঃ বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক	স্বপন সোম	জানু-ফেব্রু, 1982
পরিচিতি ঃ স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারো (1826-1910)	রবীন মজুমদার	জানু-ফেব্রু, 1982
বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার আলোচনাচক্র ঃ ডি. ডি. কোসাম্বী ঃ বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক		জানু-ফেব্রু, 1982
রসায়নবিদ লিভনার্দো দা ভিন্সি	সঞ্জয় কুমার ভট্টাচার্য ও রূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	জুলাই-আগস্ট, 1982
হাইডেকি ইকাওউয়া	প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়	মে-জুন, 1983
বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস ঃ রামানুজন, সত্যেন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র	অভিজিৎ লাহিড়ী	জানু-ফেব্রু, 1984
জন্মশতবর্ষে নীলস বোর স্মরণে	সুব্রত ভট্টাচার্য	জানু-ফেব্রু, 1986

আরো বিকলাঙ্গ শিশু
অথবা
আর হাইডোজ ই. পি. নয়

ফিরে দেখা

কোনো মহিলা মা হতে চলেছেন কি না, তা জানার জন্যে এদেশের বহু ডাক্তার, অ-ডাক্তার ও হাতুড়েরা দু'দশকেরও বেশি সময় ধ'রে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোন জাতীয় কৃত্রিম (synthetic) হরমোনের উচ্চমাত্রার সংমিশ্রণ (সংক্ষেপে হাইডোজ ই. পি.) মহিলাদের শরীরে প্রয়োগ ক'রে আসছিলেন। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে ইউরোপের বহু দেশেও গর্ভ-সঞ্চার নির্ণায়ক ওষুধ হিসেবে হাইডোজ ই. পি. চালু ছিল। সমস্ত প্রথাগত নিয়মকানুন মেনে জীবজন্তুদের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষার চৌকাঠ পেরিয়েই এ ওষুধ একসময় বাজারের ছাড়পত্র পেয়েছিল। কিন্তু বাজারের ছাড়পত্রই কোনো ওষুধের নিরাপত্তা সংক্রান্ত শেষ কথা নয়।

□ হাইডোজ ই পি'র বাজারি নামধামের তালিকা □

বাজারী নাম (Brand name)	রকম (Form)	প্রস্তুতকারক কোম্পানি
মেনস্ট্রোজেন	ইনজেকশন ও ট্যাবলেট	ইনফার
মেনস্ট্রোজেন ফোর্ট	ইনজেকশন	ইনফার
অর্গালুটিন	ট্যাবলেট	ইনফার
ই. পি. ফোর্ট	ট্যাবলেট ও ইনজেকশন	ইউনিকেম
ওরাসিক্রন ফোর্ট	ট্যাবলেট	নিকোলাস
প্রকটিনাল	ট্যাবলেট	বিডল সো-ইয়ার
গাইকলনর্ম	ইনজেকশন	মেডিক্যাল প্রোডাক্ট অব ইণ্ডিয়া

সূত্র : WBMSRU এবং AHSD, WB-র প্রচারপত্র

কেননা, কোনো ওষুধ দীর্ঘদিন ধ'রে প্রয়োগের ফলে মানুষের শরীরে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, ছাড়পত্রের পরীক্ষায় তার উত্তর প্রায়ই মেলে না। কোনো ওষুধের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া ওষুধ প্রয়োগের দীর্ঘদিন পরেও দেখা দিতে পারে। এসব কারণে উন্নত দেশগুলোতে বাজারে ছাড়পত্র পাওয়া সমস্ত ওষুধের প্রয়োগ যেমন চলতে থাকে, তেমনই ওষুধটি প্রয়োগের ফলে কোনো অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না, সেদিকেও নজর রাখা হতে থাকে। এই নজরদারির ব্যবস্থা (monitoring system) গর্ভবতী মহিলাদের ওষুধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এঁদেরকে কোনো ওষুধ পরীক্ষার গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা কেবল অনৈতিকই নয়, সম্পূর্ণ বেআইনি।

এই নজরদারির ব্যবস্থায় 1967 সালে প্রথম হাইডোজ ই.পি.'র ক্ষতিকারক দিক ধরা পড়া শুরু হয়। একে একে পনেরোটি দেশে ওষুধটির ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 1979 সালে এদেশের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি. পালনি আপ্রাণের রিপোর্টে প্রকাশ পায়, যেসব সন্তান-সম্ভবা মহিলারা এ ওষুধ ব্যবহার করেছেন, তাঁদের তিরিশ শতাংশই বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিয়েছেন। বেশ কিছু খবরের কাগজে ও পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক অবধি বিষয়টা গড়ায়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চকে (ICMR) এ ওষুধটি সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে একটি রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেন। ICMR হাইডোজ ই.পি. ওষুধটিকে আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষে রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে 1982 সালের জুলাই মাসে ড্রাগস্ কন্ট্রোলার অব ইণ্ডিয়া (DCI) হাইডোজ ই.পি. নিষিদ্ধ করেন এবং প্রস্তুতকারক কোম্পানি-গুলোকে 1983 সালের 30শে জুনের মধ্যে ওষুধটিকে বাজার থেকে তুলে নিতে নির্দেশ দেন। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইনফার কোম্পানি এবং বোম্বে হাইকোর্ট থেকে ইউনিকেম ও নিকোলাস কোম্পানি স্থগিতাদেশ আদায় করে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ডাক্তারদের কোনো সর্বভারতীয় সংগঠনকেও এ বিষয়ে আদালতে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। ফলে, স্থগিতাদেশ বজায় থাকে, আর সেই সাথে চালু থাকে ভারতের বাজারে হাইডোজ ই.পি.-র অবাধ বিক্রি। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন কেরলের জনস্বাস্থ্য প্রতিরক্ষা সংগঠনের তরফ থেকে একজন অ-ডাক্তার ব্যক্তি (পেশায় আইনজীবী)— শ্রী ভিনসেন্ট পানিকুলাঙ্গার। এবার ঘটনাটা সুপ্রিম কোর্টের আওতায় আসে। 1986 সালে সুপ্রিম কোর্ট শ্রী পানিকুলাঙ্গারের উদ্যোগের প্রশংসা ক'রে বলেন, কোর্ট বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নিতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট তাই DCI-কে, দিল্লি ছাড়াও অন্য শহরে এই ওষুধের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে কিনা তা নিয়ে পাবলিক হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। কোনো ওষুধ নিয়ে এ ধরনের ঘটনা ভারতে এই প্রথম। খুব অল্প সময়ের নোটিশে DCI মাদ্রাজে ও দিল্লিতে শুনানির আয়োজন করেন। কিন্তু কলকাতায় এই আয়োজন করতে DCI টালবাহানা শুরু করলে অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল (AHSD, WB) গত 23শে মে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে এক কনভেনশনের ব্যবস্থা করেন। এই কনভেনশনে হাইডোজ ই.পি.-র বিরুদ্ধে এবং DCI-এর ভূমিকার সমালোচনা ক'রে প্রস্তাব

গৃহীত হয়। AHSD, WB; ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম (DAF) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টিটিভস ইউনিয়ন (WBMSRU) শতাধিক চিকিৎসকের স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি পাঠান DCI-এর কাছে। এতে কলকাতায় শুনানির ব্যবস্থা ক'রে চিকিৎসক ও জনসাধারণের বক্তব্য শোনার আবেদন জানানো হয়।....অবশেষে DCI কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরির প্রেক্ষাগৃহে দশই জুলাই পাবলিক হিয়ারিং-এর আয়োজন করেন।

গিয়ে দেখা

দশই জুলাই সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে গিয়ে দেখি, গেটের পাশে ফুটপাথে একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন গণসংগঠনের তরফ থেকে বক্তারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাইডোজ ই. পি. নিষিদ্ধ করার পক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন। মঞ্চের আশেপাশে WBMSRU; AHSD, WB এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, মেডিক্যাল আঞ্চলিক কমিটির ব্যানার। টাঙানো রয়েছে নানান পোস্টার: "বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের জন্য দায়ী বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি অর্গানন (ইনফার) ও তাদের সমর্থনকারীদের ই. পি. ফোর্ট বিক্রির চক্রান্ত ব্যর্থ করুন," "ইনফার ও ইউনিকেমের তাঁবেদাররা দূর হটো," "অর্গানন (ইনফার) কেন হাইডোজ ই. পি. নিজের দেশে চালু করেনি?" "Save our children and women from the banned drugs sold by multinationals"। তবে এসবের পাশাপাশি "না হিরোশিমা আর নয়," "মানবতার স্বার্থে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ কর", "ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা ঘোষণা করতে হবে" জাতীয় পোস্টার বেমানান লাগছিল।

ওদিকে সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরির প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। সেখানে ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, ডাঃ ভবেশ লাহিড়ী, ডাঃ এন. রায়চৌধুরী, ডঃ বি. ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তারা হাইডোজ ই. পি. নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে থাকেন। একজন বক্তা ওষুধটি নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে একবার বলার পর আরো একবার বলতে চাইলে চেয়ারম্যান তা মঞ্জুর করলেন। সভায় চ্যাঁচামেচি শুরু হোলো। "অনেক বক্তা আছে, একজনকে দু'বার বলতে দেয়া চলবে না" দাবিতে বহু শ্রোতা সোচ্চার হলেন। দ্বিতীয়বার বলতে চাওয়া বক্তাটি সোচ্চার শ্রোতাদের "গুণ্ডা" বলার পরই তাঁর গায়ে চড়-থাপ্পড় পড়া শুরু হোলো। এ অবস্থায় হৈ-হট্টগোলের মধ্যে সভা পণ্ড হোলো বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ। বেলা একটা নাগাদ পাবলিক হিয়ারিং প্রত্যাহৃত (called off) হওয়ার অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দেয়া হোলো। এবার সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবের সামনে বেশিরভাগ

□ গর্ভপাত ঘটানোর আশায় হাইডোজ ই.পি.'র ব্যবহার অবৈজ্ঞানিক □

[আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ পীযূষকান্তি সরকারের সঙ্গে সুদীপ্ত সরস্বতীর সাক্ষাৎকার]

● গর্ভনির্ণয় ছাড়াও বহু মহিলাই গর্ভপাতের উদ্দেশ্যেও হাইডোজ ই. পি. ব্যবহার করেন বলে শুনেছি। গর্ভপাত ঘটাতে হাইডোজ ই. পি. কতটা কার্যকর?

□ গর্ভধারণ করলে শরীরের নিজস্ব নিয়মেই মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গর্ভধারণ ছাড়া আরো নানা কারণে (যেমন—যক্ষ্মারোগ বা টি. বি., হর্মোনের গণ্ডগোল, মানসিক অশান্তি এসব) মাসিক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অথচ আমাদের দেশের বহু মহিলা সঠিক জ্ঞানের অভাবে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়াকে গর্ভধারণের সমার্থক ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। মাসিক বন্ধ হলে তাঁদের অনেকেই গর্ভপাতের উদ্দেশ্য নিয়ে হাইডোজ ই. পি. গ্রহণ করেন। গর্ভধারণ ছাড়া অন্য যেসব কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাদের কয়েকটিমাত্র ক্ষেত্রেই কেবল হাইডোজ ই. পি. আবার সাময়িকভাবে মাসিক চালু করতে পারে। তবে প্রকৃত রোগের চিকিৎসা না হলে স্থায়ী সুফল পাওয়া যাবে না।...যাই হোক, হাইডোজ ই. পি. গ্রহণ করার পর ঐ সব ক্ষেত্রে মাসিক আবার চালু হলে মহিলা ধরে নেন, গর্ভপাত হয়ে গেছে। অথচ অর্ভপাতের উদ্দেশ্যে হাইডোজ ই. পি. ব্যবহারের ভিত্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নেই—যাঁরা ব্যবহার করেছেন, তাঁদের ভ্রান্ত ধারণার ওপর গড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণই এর রসদ যোগাচ্ছে।

● দশই জুলাইয়ের পাবলিক হিয়ারিংয়ে কোনো বক্তা বলেছিলেন, "আট থেকে দশ শতাংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা জড়িয়ে আছে হাইডোজ ই. পি. ব্যবহারের বেলায়"। অথচ একটু আগেই আপনি বললেন, গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে হাইডোজ ই. পি.-র ব্যবহার অবৈজ্ঞানিক...।

□ হ্যাঁ, এখনও তাই বলছি। প্রতি একশো জন গর্ভবতী মহিলার ভেতর দশ থেকে পনেরো জনের গর্ভপাত ঘটেই থাকে। এটা আজকের যুগেও স্বাভাবিক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে স্পনটেনিয়াস্ অ্যাবরশন্। অনেক মহিলার আবার প্রায়ই গর্ভপাত ঘটে যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একে বলে হ্যাবিচিউয়াল বা রেকারেন্ট অ্যাবরশন্। এসব ক্ষেত্রে হাইডোজ ই. পি. গর্ভপাতের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তবে নব্বই শতাংশ গর্ভবতী মহিলার বেলায় হাইডোজ ই. পি. গর্ভপাত ঘটাতে পারে না। অথচ গর্ভস্থ ভ্রূণের বিকৃতির আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

শ্রোতা বিক্ষোভ জানাতে শুরু করলেন। বেলা আড়াইটে নাগাদ পুলিশ পাহারায় আবার শুনানি শুরু হোলো। এই পর্যায়ে বেশির ভাগ বক্তাই হাইডোজ ই. পি. নিষিদ্ধ করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

যেসব বক্তা হাইডোজ ই. পি. চালু থাকার পক্ষে, তাঁদের যুক্তি এরকম ঃ

□ গর্ভনির্ধারণের জন্য আজকাল আর কেউই এ ওষুধ ব্যবহার করেন না। কাজেই এটা চালু থাকার সাথে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর প্রশ্নই ওঠে না।

□ মহিলাদের কতকগুলো অসুখ আছে, যেমন এণ্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাসারম্যানস সিনড্রোম, ডিস্‌মেনোরিয়া, ডিসফাংশনাল ইউটেরাইন হেমোরেজ, গর্ভাবস্থা নয় এমন কোনো কারণে সেকেণ্ডারি অ্যামেনোরিয়া, এসবের চিকিৎসা করতে হাইডোজ ই. পি. ছাড়া গতি নেই।

□ একজন স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ অবশ্য বললেন, "আমার দীর্ঘ চিকিৎসকজীবনে গর্ভনির্ণয়ের জন্য আমি হাইডোজ ই. পি.-ই প্রয়োগ ক'রে আসছি। ভবিষ্যতেও তাই করব, কেননা, এ ওষুধ ব্যবহারের ফলে কারও কোনো ক্ষতি হতে আমি দেখিনি"।

ওদিকে ডাঃ পীযূষকান্তি সরকার, ডাঃ নিতাই বাগচী, ডাঃ কল্যাণ-কুমার ঘোষ, ডাঃ মীরা শিবা, ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, ডাঃ বি. নাগ, ডাঃ স্মরজিৎ জানা, ডাঃ সুজিত কুমার দাশ প্রমুখ বক্তাদের হাইডোজ ই. পি. নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি এরকম—

□ সন্তানসম্ভবা মহিলাদের হাইডোজ ই. পি. গ্রহণের সাথে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মদানের সম্পর্ক বার বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও এরকম ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া যায়, অর্থাৎ গর্ভনির্ণয়ের জন্য হাইডোজ ই. পি. আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং ভারতের মতো দেশে, যেখানে অডাক্তার ও হাতুড়েরাও অবাধে ওষুধ প্রয়োগ করতে পারে, সেখানে হাইডোজ ই. পি. নিষিদ্ধ না হলে এরকম হবেই।

□ ঐদিন নারীনির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চের প্রতিনিধি ওষুধের দোকানে গিয়ে গর্ভনির্ণয়ের ওষুধ চাইলে কোনোরকম প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ই. পি. ফোর্ট পান। এভাবে কেনা ই. পি. ফোর্ট তিনি পাবলিক হিয়ারিং-এ পেশ ক'রে বলেন, "হাইডোজ ই. পি. যে অবাধে বিক্রি হচ্ছে, এটা তারই প্রমাণ।"

□ হাইডোজ ই. পি.-র ব্যবসা মূলত দাঁড়িয়ে আছে গর্ভনির্ণয়ে (এ প্রসঙ্গে ডঃ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য) এর ব্যবহারকে ভিত্তি ক'রে। 1985 সালের এক হিসেব অনুযায়ী এদেশে প্রায় বার্ষিক 7 কোটি টাকার ব্যবসা চলছে হাইডোজ ই. পি. জাতীয় ওষুধগুলোর বিক্রিকে কেন্দ্র ক'রে। যেসব বিরল অসুখে হাইডোজ ই. পি. ব্যবহারের পক্ষে অনেকে ওকালতি করেন, শুধু সেসব অসুখে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকলে নিশ্চয়ই এত টাকার ব্যবসা চলত না।

□ কোনো মহিলার পেচ্ছাবে এইচ. সি. জি. (হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন নামে একরকমের হরমোন) আছে কি না, তা নির্ধারণের মাধ্যমে কেউ সন্তানসম্ভবা কি না, তা বোঝা যায়। এই পদ্ধতি মা ও শিশু—কারো শরীরের পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়। অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার নির্ণয়ে হাইডোজ ই. পি. অপরিহার্য নয়।

□ পেচ্ছাব পরীক্ষা ক'রে গর্ভসঞ্চার নির্ণয়ের পদ্ধতিটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য—প্রায় একশো শতাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে। অথচ হাইডোজ ই. পি. ব্যবহার ক'রে গর্ভনির্ণয়ের পরীক্ষায় পঁচিশ শতাংশ ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আট থেকে দশ শতাংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা জড়িয়ে আছে এই ওষুধটি ব্যবহারের বেলায়। অর্থাৎ নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা—দুদিক থেকেই পেচ্ছাব পরীক্ষার পদ্ধতি হাইডোজ ই. পি. ব্যবহারের পদ্ধতির চেয়ে এগিয়ে আছে।

□ এণ্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাসারম্যানস সিনড্রোম, এসব রোগের চিকিৎসাতেও হাইডোজ ই. পি. অপরিহার্য নয়। যেসব দেশে হাইডোজ ই. পি. বাজারে কিনতেই পাওয়া যায় না, সেসব দেশের মহিলাদের কি এই রোগগুলো হয় না, নাকি হাইডোজ ই. পি.-র অভাবে এঁদের চিকিৎসা আটকে থাকে?

□ তর্কের খাতিরে যদি ধ'রেও নেওয়া যায়, কোনো বিরল রোগের চিকিৎসায় হাইডোজ ই. পি. ছাড়া গতি নেই, তাহলেও হাইডোজ ই. পি. নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। কেননা, বাজারে কৃত্রিম (synthetic) ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরোন সবসময়েই পাওয়া যায়। যেমন গর্ভনিরোধক বড়িতেই (oral contraceptive pills) কম মাত্রায় কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোন থাকে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যে অনুপাতে চান, সেই অনুপাতেই এ দুটোকে মিশিয়ে রোগীর শরীরে প্রয়োগ করতে পারেন। উচ্চমাত্রায় এদেরকে মিশিয়ে দেওয়ার কাজটা ওষুধ কোম্পানির হাতে নাই বা থাকল।

□ নতুন কোনো ওষুধ এ দেশে চালু করার সময় উন্নত দেশের বিজ্ঞানীদের তথ্য গ্রহণ করব, অথচ বাতিলের বেলায় তা করব না কেন?

□ কোনো স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ যদি আজকের দিনেও প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে পারেন যে, তিনি গর্ভনির্ণয়ের জন্য হাইডোজ ই. পি. এখনও ব্যবহার করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, তাহলে আর

□ যেসব দেশে হাইডোজ ই. পি. নিষিদ্ধ হয়েছে □

ডেনমার্ক (1974), আমেরিকা (1975), গ্রেট ব্রিটেন (1977) অস্ট্রেলিয়া (1978), ইটালি (1978), বেলজিয়াম (1978), সিঙ্গাপুর (1978), পশ্চিম জার্মানি (1980), গ্রীস (1980), দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, ভেনিজুয়েলা, থাইল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে।

সূত্র ঃ ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম

এদেশের হাজার হাজার হাতুড়েদের দোষ কি? (একথা বলার সময় শ্রোতাদের একটা বিরাট অংশ "শেম্", "শেম্" আওয়াজে সভাকক্ষ ভরিয়ে তোলেন।) "আমার চোখে পড়েনি, অতএব ঘটনাটা ঘটে না"—এটা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার লক্ষণ নয়।

যাই হোক, কলকাতার এই শুনানিতে হাইড্রোজ ই. পি. নিষিদ্ধ করার পক্ষের বক্তারাই সংখ্যার দিক থেকে ভারী ছিলেন।....আমরা সাগ্রহে এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপেক্ষায় রয়েছি।

কিছু কথা

আমাদের দেশে অল ইণ্ডিয়া ড্রাগ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (AIDAN)-এর (যার পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি DAF) মতো গণসংগঠনকেই (বহু ডাক্তারও যার সঙ্গে যুক্ত) ওষুধ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখছিলাম। কিন্তু কোনো "নিষিদ্ধ" ওষুধ এদেশে নিষিদ্ধ করার দাবিতে ডাক্তারদের কোনো সর্বভারতীয় বা রাজ্যব্যাপী সংগঠনকে আগে কখনও এগিয়ে আসতে দেখিনি। এবার ডাক্তারদের সংগঠন AHSD, WB-কে একাজে এগিয়ে আসতে দেখে ভালো লাগছে, আশাও বাড়ছে। জনবিরোধী ওষুধকে বাজার থেকে তুলে নিতে ওষুধ কোম্পানিকে বাধ্য করতে পারে জোটবদ্ধ ডাক্তারদের সর্বভারতীয় আন্দোলন। □

সুদীপ্ত সরস্বতী

মন্দির বাজারঃ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

"কারখানা হোক, না হোক, জমিজমার প্রশ্নে তেনারা কিছু বলতেই দেবেন না ঠিক করেছেন। বাপের জমি, বিশ-তিরিশ বছর চাষ করি সবাই। নিজেদের জমিতে কারখানা হতে দেব কিনা, দূষণ হতে দেব কিনা, সে আমরাই ঠিক করব। সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না"। এক নিঃশ্বাসে উত্তেজিত স্বরে কথাগুলো বললেন শ্যামসুন্দর ভাণ্ডারি, রামকৃষ্ণপুরের গরীব চাষী। সেপ্টেম্বরে ক'দিন মন্দিরবাজার ঘুরে এ প্রতিবেদকের মনে হয়েছে, ওখানে দূষণ বনাম শিল্পায়নের ইস্যুটির পাশাপাশি অনিবার্যভাবেই অন্য একটি ইস্যু জোরদার হচ্ছে। সেটি আন্দোলন করার অধিকারের প্রশ্ন। ভিন্ন মত প্রকাশ করার এবং সে মত অনুসারে কিছু সক্রিয় ভূমিকা নেবার অধিকারের প্রশ্ন।

কুণ্ডুপদ চৌধুরী, যিনি হিমাংশু চ্যাটার্জির জমিতে বিশ বছর ধরে ভাগচাষ করছেন, সেই কুণ্ডুবাবুকে আগাম কিছু না জানিয়েই মালিক জমি বিক্রি করেছেন—'সুন্দরবন ফার্টিলাইজার লিমিটেড'কে, স্থানীয় দালাল অনাথ খামারুর মাধ্যমে। এরপর সব জানতে পেরে কুণ্ডুবাবু সবই জানান 'মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'কে। তারপর থেকে ছ'সাত মাস ধরে কুণ্ডুবাবু কমিটির সাথে থেকে পরিবেশ রক্ষার স্থানীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এবং নানা গালিগালাজ, নিগ্রহর ভয় দেখানোর পর 13ই আগস্ট রাতে ঘটল পুলিশী অত্যাচার। মন্দির-বাজার থানার ও সি'র নেতৃত্বে একদল পুলিশ রাত একটা নাগাদ কুণ্ডুপদ-বাবুর বাড়ী রেইড করে। কুণ্ডুবাবু পুলিশ আসছে শুনে বাড়ী থেকে সরে অন্যত্র আত্মগোপন করেন। তল্লাসি করব অথচ কিছুই 'আটক' করব না, এমন শৃঙ্খলা রক্ষার দায় পুলিশের নেই। তাই ঐ রাতে কুণ্ডুবাবুর ছোট ছেলে চোদ্দ বছর বয়সের রমেশ চৌধুরীকে পুলিশ জোর করে তুলে নিয়ে যায়। কোন ওয়ারেন্ট ছিল না। কোন নির্দিষ্ট ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্টও নেই তখনও অব্দি, কুণ্ডুবাবুর নামে। এদিকে রমেশকে টানা তিনদিন থানায় আটকে রেখে হুমকি, ভয় দেখানো হয়। 16ই অগস্ট থানায় গিয়ে গাববেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান ফাল্গুনী চৌধুরীর নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষজন রমেশকে বিনা শর্তে মুক্ত করে আনেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিশ এরপর 17ই আগস্ট কুণ্ডুবাবু ও তাঁর বড় ছেলে রবীন চৌধুরীর নামে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা কোর্টে মামলা রুজু করেছে চুরির অভিযোগে।

থানা, বি. ডি. ও. দপ্তর, এস. ডি. ও. দপ্তর, কোর্টে যখন 15ই অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উড়ছে, ফুলচন্দন পড়ছে জাতির জনক-জননীদের ফটোয়, ঠিক তখন মন্দিরবাজারে চলছে গরীব মানুষদের ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা দমনের পালা। 14ই অগস্ট কোম্পানির দালাল অনাথ খামারুর অভিযোগক্রমে থানা নোটিশ দিয়ে জয়মাল্য সর্দারকে থানায় ডেকে আনে। কুণ্ডুবাবুকেও ডেকেছিল, কুণ্ডুবাবু যাননি। কিন্তু সরল বিশ্বাসে জয়মাল্যবাবু গেছিলেন। ও. সি জয়মাল্যবাবুকে ভয় দেখান যে, জয়মাল্য যেন জমিমালিক নন্দদুলাল ব্যানার্জির (এরই জমিতে জয়মাল্যবাবু ভাগচাষী) জমিতে জোর করে চাষ করা বন্ধ করেন। নচেৎ কপালে বহু দুর্ভোগ আছে। জয়মাল্যবাবু বলেন, এতদিনকার ভাগচাষী আমি, বিনা অপরাধে চাষের অধিকার ছাড়ব না। তখন ও. সি তাকে মা ধোর করেন। তারপরেও জয়মাল্যবাবুকে লোভ দেখান হয় যে, 'তোকে দশ হাজার টাকা দেব ক্ষতিপূরণ বাবদ। তুই লিখে দে, এ জমিতে তোর কোনো অধিকার নেই।' কিন্তু জয়মাল্যবাবু এ ফাঁদে পা দেননি।

থানার ও সি 18ই আগস্ট সকাল দশটায় থানায় হাজির হতে আদেশ করে একটি চিঠি পাঠান বিশুদ্ধানন্দ পুরকায়েতকে, যিনি প্রতিরোধ কমিটির সক্রিয় কর্মী। ঐ চিঠিটি কিন্তু ঐ দিন সকালেই সাড়ে ছটার সময় বিশুদ্ধবাবুর বাড়ীতে দেওয়া হয়। কেন আসতে বলা, কীসের আদেশ, কিছুই লেখা নেই চিঠিতে। ঘটনা হচ্ছে এই যে, থানার প্রায় কোনো পদক্ষেপেরই লিখিত রেকর্ডস থানাতেই নেই। ঐ চিঠিটিও অনঅফিসিয়াল, কারণ তাতে থানার স্ট্যাম্প, প্যাড কিছুই ব্যবহৃত নয়। বিশুদ্ধবাবু যাননি অবশ্য। 20শে অগস্ট সন্ধ্যেয় থানা দু'জিপ পুলিশ পাঠায় সুলতানপুরে। প্রথমেই আটক করে বিশ্বনাথ হালদারকে, উনি প্রতিরোধ কমিটির কর্মী। তাকে ও সি নির্দেশ দেয়, অন্যান্য কর্মীদের বাড়ী চিনিয়ে দিতে, কোথায় এখন পাওয়া যাবে তা বলতে। কিন্তু তিনি হুমকি সহ্য করেও কিছু জানাননি। এরই প্রতিবাদে 21শে অগস্ট দুপুরে দু'লরি মানুষ গিয়ে ডায়মণ্ডহারবার এস. ডি. ও.-র কাছে ডেপুটেশন দেন। এস. ডি. পি. ও. 23শে অগস্ট কমিটির চারজনকে থানায় আসতে বলে চিঠি দেন। সেখানে মীমাংসার সূত্র খোঁজা হয়। মন্দিরবাজারের মানুষ জানতে চান, এসবের মানে কী। কিন্তু তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব এস. ডি. ও. বা এস ডি.পি.ও. নেবেন না। থানার শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়, তাও স্বার্থমত আইনভঙ্গ করে। 10ই সেপ্টেম্বর মন্দিরবাজার বি. ডি. ও. চিঠি দিয়ে চল্লিশজন জমি-মালিককে তার অফিসে ডাকেন, যাদের জমি কেনা কারখানা বসানোর জন্য জরুরী অথচ যারা দূষণের ভয়ে জমি বিক্রি না করার কঠিন সিধান্ত নিয়েছেন। সেই মিটিং-এ বি. ডি. ও. উপস্থিত জমি-মালিকদের শিল্পায়নের স্বার্থে এলাকার উন্নতির স্বার্থে জমি বিক্রি করতে প্ররোচিত করেন। সকলে দূষণের প্রশ্ন, জমি বিক্রি না করার স্বাধীনতার প্রশ্ন তুললে বি. ডি. ও. অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করে একতরফা ভাবে মিটিং বন্ধ করে দেন। অপমানিত বোধ করে সবাই বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় এম এল এ সুভাষ রায় সি পি এম আঞ্চলিক কমিটিকে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্দেশ দেন জমি কিনতে কোম্পানীকে সাহায্য করার জন্যে। নিজেও জমিবিক্রি করতে মালিকদের প্ররোচিত করতে থাকেন। 26 শে জুন এম. এল. এ কারখানা কোনো দূষণ ছড়াবে না, এ বক্তব্য বিশদে জানিয়ে কারখানা বসানোর অনুমোদন দিতে 'অনুরোধ' করেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। এ নিয়ে সাধারণ সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

সত্যিই মন্দিরবাজার এখন দু'শিবিরে বিভক্ত। একপক্ষে শতকরা নব্বইজন মানুষ, যাঁরা দূষণ চান না, চাষীজমিকে শিল্পজমিতে পরিণত করতে চান না, এলাকার একফসলী চাষকে বিপর্যস্ত করতে চান না এবং বেকারত্বের সঠিক সমাধান চান। অন্যপক্ষের মূল যোদ্ধা কোম্পানী। তার সাথে স্থানীয় দালাল, কিছু জমিমালিক, কিছু শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী। এবং ক্রমশঃ থানা, বি ডি ও, এম এল এ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে কোম্পানীর হয়ে যুদ্ধ করছেন স্থানীয় মানুষের বিরুদ্ধে।
কোম্পানী স্পষ্টতই আইন ভেঙেছেন জমি কেনার ক্ষেত্রে। পুলিশ গ্রেপ্তার, বিনা অভিযোগে আটক ইত্যাদি করে আইন ভেঙেছেন। এসব কারণেও, যারা এতদিন দূষণ—বিরোধী হওয়া সত্বেও কারখানা বসানোর সপক্ষে ছিলেন, তারা কোম্পানী ও পুলিশের কীর্তিকলাপে সন্দিগ্ধ হচ্ছেন। কারখানা বসার আগেই যারা এত গায়ের জোর দেখাচ্ছে, একবার কারখানা চালু হলে পর তারা আর দূষণ-ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কথা শুনবে?

দীপক

With best compliments from :

Dalmia Dairy Industries Ltd.

12-B. Stephen House

4, B B. D. Bagh East

Calcutta-700 001

Makers of Quality Milk Products

জপুরে ক্রোমিয়াম দূষণ

সারবের মধ্যে ভূত

প্রায় মাস দুয়েক আগে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির আইন-আদালত সংক্রান্ত স্তম্ভে একটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার মর্ম সংক্ষেপে এই যে—দক্ষিণ দমদমের জপুর রোডে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে একটি রাসায়নিক কারখানা, মেকাল কেমিক্যাল লিমিটেড থেকে ক্রোমিয়াম দূষণ হচ্ছে, এই অভিযোগে স্থানীয় ভুক্তভোগী জনসাধারণের পক্ষে কয়েকজন ব্যক্তি কারখানাটি বন্ধ করার দাবী নিয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেছেন। পরিবেশ দূষণের প্রমাণস্বরূপ তাঁরা আদালতে উপস্থিত করেন কারখানার আশেপাশের কিছু কুয়ো এবং পুকুরের জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণের দুটি রিপোর্ট। এর মধ্যে একটি দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন সায়েন্স-এর বিভাগীয় প্রধান ডঃ অমলেশ চৌধুরী; অপরটি ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউসন কন্ট্রোল বোর্ডের ব্যারাকপুর শাখার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রী বি. এল. চক্রবর্তীর দেওয়া। দুটি রিপোর্ট থেকেই জানা গিয়েছিল যে কুয়ো এবং পুকুরের জলে অত্যন্ত বিপজ্জনক মাত্রায় ছয় যোজ্যতার ক্রোমিয়াম উপস্থিত। এরই ভিত্তিতে বিচারপতি সুহাস সেন আদেশ দেন কারখানাটিকে এক মাসের জন্য বন্ধ রাখার। প্রায় সেই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল জপুরে যাতায়াত করতে শুরু করে—প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল অবস্থাটা খতিয়ে দেখা। এ সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদনও আপনারা গত সংখ্যার বি-ও-বি'তে পড়েছেন। ইতিমধ্যে সেখানকার জল গড়িয়েছে অনেকদূর—আক্ষরিক অর্থেই।

কারখানা বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে 9.8.'87 তারিখে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রতিনিধিরা কারখানা সংলগ্ন দাগা কলোনীর কয়েকটি বাড়ীর কুয়োর জল এবং পুকুরের জল সংগ্রহ করে আনে। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রবীন মজুমদার সেগুলিকে পরীক্ষা করে 21.8.87 তারিখে একটি রিপোর্ট দেন। তার সারাংশ নিচে দেওয়া হল :

নমুনা নং	pH	Cr (VI)-এর পরিমাণ (mg/l)
(1)	7.4–7.5	96.65
(2)	7.4–7.5	78.10
(3)	7.4—7.5	49 90
(4)	7.4–7.5	38.10
(5)	7.4—7.5	30.60
(6)	7.4–7.5	14.65
(7)	7.4—7.5	3.45
(8)	7.4—7.5	1.55

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই জলের নমুনাগুলির মধ্যে শুধু 7 নম্বরেরটি দাগা কলোনীর অন্তর্গত পুকুরের জল, বাকীগুলি সমস্তই বাড়ীর কুয়োর জল, যা কলোনীর মানুষজনের নিত্যব্যবহার্য; পানীয় হিসাবে এবং অন্যান্য কাজেও। আর, সারা পৃথিবীতে পানীয় জলে ক্রোমিয়াম (VI) এর সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা (MPC) হল 0.05 mg/l। অর্থাৎ তথাকথিত অনুমোদিত মাত্রার মানদণ্ড অনুযায়ী পরিবেশ দূষিত হয়েছে দশ থেকে হাজার গুণেরও বেশী!

কারখানার দেওয়ালের ভিতর

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যে কারখানার আশেপাশে যদি জলের উৎসগুলির এই দশা হয়ে থাকে তবে কারখানার ভিতরের অবস্থা কেমন? শ্রমিকেরাই বা তাঁদের কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে কতদূর জানেন? 1986-র Factories (Amendment) Act-এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যেকোনো hazardcus industry-র ক্ষেত্রে (যার মধ্যে ক্রোমেট শিল্পও পড়ে) মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বিশদভাবে জানাতে বাধ্য থাকবেন তাঁদের কাজ কি কি পেশাগত ঝুঁকি রয়েছে, বা স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি কারখানার আশেপাশের লোকজনও এ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে চাইলে তাঁরা তা জানাতে বাধ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও, খুব সহজবোধ্য কারণে, বি-ও-বি'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে কজন শ্রমিক কথাবার্তা বলেছেন, তাঁদের কারুরই ক্রোমেট-শিল্পের সঙ্গে জড়িত occupational hazard সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে বলে জানা যায়নি।

সাধারণভাবে দেখা গেছে যে শিল্পদূষণের সবচেয়ে জটিল, ohronic প্রতিক্রিয়াটা হয় শ্রমিকদেরই ওপর। সে কারণেই, জপুরের সোডিয়াম ডাইক্রোমেট কারখানার শ্রমিকেরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই দূষণের শিকার হয়েছেন কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোর প্রয়োজন আছে।

ক্রোমিয়াম দূষণ ছড়াচ্ছে : ক্রমশ আরো দূরে

গত দু'বছর ধরে উল্লিখিত কারখানার চত্বরের মধ্যে একটি গর্তে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে সোডিয়াম সালফেট ফেলা হত। তার সঙ্গে মিশে থাকা সোডিয়াম ডাইক্রোমেট বৃষ্টির জলে ধুয়ে এবং মাটিতে চুঁইয়ে এসে আশেপাশের জলের উৎসগুলিকে দূষিত করেছে। দূষণের অভিযোগ আদালতে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং তাঁরা প্রায় রাতারাতি নতুন একটি dumping site খুঁজে বার করে ফেলেছেন। এ জায়গাটি জপুর রোড থেকে বেশী দূরে নয়। দমদম মতিঝিল কলেজের (আর্টস) হোস্টেলের পিছনদিকে একটি বিশাল মাঠে পর্বতপ্রমাণ আবর্জনা এবং ঈষৎ হলদে রংয়ের trade effluent এর স্তূপের নীচে থেকে উঁকি মারতে দেখা যাবে একটি-ভিত্তিপ্রস্তরকে। তাতে লেখা রয়েছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভার একটি হাসপাতাল তৈরি হবে সেখানে। মাঠের পিছনে একটি বড় স্বচ্ছজলের পুকুরও রয়েছে। মাটিতে চুঁইয়ে এবং বাতাসে ছড়িয়ে ওই বিপুল

পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ অচিরেই একটি বিরাট অঞ্চলকে দূষিত করবে, নষ্ট হবে পুকুরের জলও। জপুর দাগা কলোনীর দূষণ বিরোধী কমিটির পক্ষ থেকে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে তাঁদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একটি মিটিং ডাকা হয়েছিল গত 30 শে অগস্ট। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া মেলেনি। কারণটা সম্ভবত রাজনৈতিক, এবং সহজবোধ্য—এখানে দূষণবিরোধী হওয়া মানে সরাসরি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরোধিতা করা, যে ঝুঁকি কেউই নিতে চান না।

একুশে আইন

ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশে অগস্টের মাঝামাঝি W. B. Pollutlon Control Board-এর পক্ষ থেকে জপুর দাগা কলোনীর কুয়ো, টিউবওয়েল ও পুকুরের জল এবং কারখানার অন্তর্গত পুকুরের জলের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং তার রিপোর্ট হাইকোর্টে পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে বেশীরভাগ জলের নমুনায় (একটি বাদে) Cr (VI)-এর পরিমাণ আন্তর্জাতিক অনুমোদন যোগ্য মাত্রার (MPC) থেকে কম। এরই ভিত্তিতে আদালতের আদেশে মেকাল কেমিক্যাল-এর কারখানাটি আবার খুলেছে। অর্থাৎ অব্যাহত রয়েছে আবার আগের মতো বাতাসে মাটিতে, জলে, বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকারক দূষক ছড়ানো।

গত 26শে অগস্ট কারখানার মালিকের পক্ষ থেকে একটি affidavit করা হয়, যাতে সরাসরিভাবে সর্বপ্রকার দূষণের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে যে ডঃ অমলেশ চৌধুরীর কোনো অধিকার নেই (....is not the properly authorised person....) দূষিত জলের বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট দেওয়ার। প্রশ্ন হচ্ছে—অধিকারটা তবে কার? Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, এ বলা হয়েছে যে একমাত্র Central বা State Pollution Control Board দ্বারা স্বীকৃত কোনো ল্যাবরেটরী থেকে জলের নমুনা পরীক্ষা করালে তবেই তা আদালতে গ্রাহ্য হবে, নতুবা নয়। অর্থাৎ ভূত রয়ে গেছে সরষের মধ্যেই!

একটু অন্যভাবে ব্যাপারটা দেখলে এইরকম দাঁড়ায় যে, একজন উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞের (academic বা non-academic) দক্ষতার কোনো স্বীকৃতি নেই যতক্ষণ না তিনি Pollution Control Board-স্বীকৃত কোনো ল্যাবরেটরীতে analyst-এর পদাধিকারী হচ্ছেন। দূষণ-সংক্রান্ত আইনের এই মৌলিক অসঙ্গতিটুকু থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় তার উদ্দেশ্য আসলে কি। এই বিচিত্র আইনের ফাঁক দিয়ে হয়তো সহজেই গলে বেরিয়ে যেতে পারবেন মেকাল কেমিক্যাল-এর মালিক, কারণ ফাঁকটা রাখা হয়েছে শিল্পপতির স্বার্থেই, কিন্তু এও জেনে রাখা ভাল যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন ছাড়াও অন্য আইন আছে যেখানে তাঁদের নিস্তার পাওয়াটা তত সহজ হবে না।

সুরশ্রী চৌধুরী

ক্রোমিয়াম (VI) এর-Toxicology

মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর (পরিবেশের অন্যান্য জৈব উপাদানের কথা আপাতত ছেড়েই দেওয়া গেল) ক্রোমিয়াম দূষণের প্রতিক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে এইরকম:

☐ বাতাসে ক্রোমেট/ডাইক্রোমেট যৌগের কণা ছড়িয়ে গিয়ে aerosol তৈরি করলে তার সংস্পর্শে চর্মপ্রদাহ এবং হাতে, পায়ে, আঙুলের ফাঁকে দূষণজনিত ক্ষত দেখা দিতে পারে। (ডাক্তারী পরিভাষায় Chrome hole বা Chrome Ulcer)। সময়মত চিকিৎসা না হলে এ থেকে আশেপাশের joint-এ সংক্রমণ ছড়াতে পারে, যার ফলে এমনকি একটি গোটা আঙুল পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। এছাড়া চোখের পাতায়, এবং নাকের ফুটোর গোড়াতেও ক্ষত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। দাগা কলোনীর মানুষের মধ্যে এর বেশীরভাগ উপসর্গই লক্ষ্য করা গেছে, যদিও কোনো ডাক্তারী সমীক্ষা হয়নি।

☐ তিরিশের দশকে প্রথম জানা গিয়েছিল যে ক্রোমেট-শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে ফুসফুস ও শ্বাসনালীর ক্যানসারের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে, বিশেষতঃ জার্মানী, ব্রিটেন ও আমেরিকায় শ্রমিকদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেছে যে ছয় যোজ্যতার ক্রোমিয়াম যৌগগুলি (বিশেষত অদ্রাব্য ক্রোমেট) মানবদেহে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ক্যানসারের সম্ভাবনা বহুগুণে বাড়ায়। অবশ্য এ বিষয়ে এখনো কোন নির্দিষ্ট exposure-response relationship পাওয়া যায় নি।

☐ নাকের মিউকাস মেমব্রেনের ওপর ক্রোমেট কণার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। বহুদিন ধরে ক্রোমেট-কণাযুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিলে শ্বাসনালীর উপরদিকে chronic irritation জনিত নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ক্রোমেট শিল্পের শ্রমিকদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে অনেকেরই নাকের septum ফেটে গেছে (perforation of the nasal septum)। এই উপসর্গটি যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক নয়, এবং সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করে না বলে অনেকেই এটা বুঝতে পারেন না।

☐ ক্রোমেট-কণার সংস্পর্শে allergic reaction-ও হতে পারে। উপসর্গ—হাঁপানী বা চর্মপ্রদাহ।

☐ খাবারের সঙ্গে ক্রোমিয়াম (VI) যৌগ পেটে গেলে বমিভাব, পেটব্যথা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। পৌষ্টিকনালী থেকে শোষিত হয়ে রক্তে পৌঁছলে ক্রোমেট আয়ন রক্তের প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর জন্য নানারকম জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এছাড়া, প্রচণ্ড ক্ষতি হয় কিডনীর।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যে প্রায় সবক্ষেত্রেই ক্রোমেট দূষণের ওপর epidemiological surey ইত্যাদি হয়েছে প্রধানত ক্রোমেট-শিল্পের শ্রমিকদের ওপর। জপুরের অবস্থাটা সে তুলনায় একটু অন্যরকম। এখানে ক্রোমিয়াম দূষণ ছড়িয়েছে শুধু বাতাসের মাধ্যমে নয়, জলের মাধ্যমেও। তাছাড়া, এখানে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বেশীরভাগই শ্রমিক নন। সব মিলিয়ে বলা যায় যে এখানে ক্রোমেট দূষণের প্রতিক্রিয়ার ওপর intensive সমীক্ষা ও (সম্ভব হলে) গবেষণা চালানো যেতে পারে। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা গেলে তার দায় আমাদের, গণবিজ্ঞান-কর্মীদের ওপরই বর্তাবে।

R. N. 34929/79
YEAR 11 NUMBER 2-3

A bi-monthly magazine
VIGYAN O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
EC 106, Salt Lake, Cal-64
Sept.-Dec. 1987

Jaishwal Traders

Engineer, Brick Manufacturer & Govt. Contractor

SATISH NANDI ROAD

P. O. Kanchrapara

Dist. 24 paraganas

West Bengal

Phone : { Kalyani-474
Calcutta-35-4987 pp

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15 সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9, থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।